॥ গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য ॥

গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য

শান্তিদেব ঘোষ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ :
৭ই চৈত্র,
১৮৮১ শকাব্দ

তিন টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

গ্রামীণ সংস্কৃতির দরদী সেবিকা
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে

ভূমিকা

গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ নানা প্রকার গ্রামীণ নৃত্য ও অভিনয় দেখে বেড়িয়েছি। বিভিন্ন পত্রিকায় তার পরিচয়ও প্রকাশ করেছি বারে বারে। গ্রামীণ নৃত্য বিষয়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে উত্তর দিতে হয়েছে সাময়িক পত্রের সাহায্যে। তারই কতকগুলি এই বইটির জন্যে আজ বেছে নেওয়া হল। শ্রীসাগরময় ঘোষ, শ্রীশুভময় ঘোষ ও শ্রীমতী ইলা ঘোষের একান্ত উৎসাহে ও সাহায্যেই বইটির প্রকাশ আজ আমার পক্ষে সহজ হয়েছে। শিলচরের লোক-নৃত্যের ছবি কটি নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী রেবা নাথ আমাকে ব্যবহার করতে দেওয়ায় আমি বিশেষ ভাবে উপকৃত। বইটি প্রকাশের জন্যে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাকে যে ভাবে উৎসাহিত করেছেন তার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

শান্তিনিকেতন
বিজয়া দশমী, ১৩৬৬

শান্তিদেব ঘোষ

ভারতীয় গ্রামীণ-নৃত্যের প্রকৃতি

সব দেশের সব রকমের গ্রামীণ-শিল্প, সংগীত ও নৃত্যই হোলো গ্রামের মনের একটি স্বতঃ-উৎসারিত প্রকাশ। এতে নেই কোন বিশেষ চেষ্টার, বা বাইরের থেকে ধার করা অনুকরণের স্পৃহা। গ্রামীণ-শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য ও কাব্য দিয়ে প্রত্যেক দেশের জনগণের মানসিক উন্নতির পরিচয় যত সহজ হয় অন্য কিছুতে এমন হয় না।

আমাদের দেশের মানব-সমাজ স্বভাবতই ধর্মভীরু বা অধ্যাত্মবাদী। গ্রামের সাধারণ অশিক্ষিতরা দুরূহ দর্শনের তত্ত্ব যত সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, দেখা গেছে এ যুগের শিক্ষিত যুবকরাও তা পারে না। সাধারণ গ্রামের বৈরাগী-বাউলরা যে সব তত্ত্ব-কথার গান রচনা করে বা গেয়ে বেড়ায়, তাতে তাদের চিন্তার গভীরতার পরিচয়ে আশ্চর্য না হয়ে পারি না। ভাবি যে পূর্ব-পুরুষদের গণশিক্ষার রীতি কি রকম সার্থক ছিল। এ শিক্ষার ধারায় কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। জনগণ যে কখন নিজেদের অজ্ঞাতে নানা দুরূহ জ্ঞান আহরণ করে, তা তারাও হয়তো সব সময় বুঝে উঠতে পারে না। ভারতের প্রাচীন এই গণশিক্ষার পদ্ধতিটি কোন বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের, কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন দল বিশেষের চেষ্টায় গড়ে উঠেনি। এ ধারা প্রচারিত হয়েছিল প্রাচীনকালের জ্ঞানীদের দ্বারা। ভারতের এই গ্রামবাসীরা অনেকেই লিখতে বা পড়তে পারে না, তবুও ভালো ভাবে জীবন-যাত্রার পক্ষে যেটুকু সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তা তারা ত পেতই, তাছাড়া এই লেখাপড়া না জানাদের ভিতর থেকেই যুগে যুগে কত মহাপুরুষ জন্মেছেন—ইতিহাসে তার পরিচয় কম নয়। জানি না, কী দূরদৃষ্টির বলে তাঁরা গণশিক্ষার এত সহজ, সুন্দর পন্থাটি আবিষ্কার করেছিলেন,

যার প্রভাব যুগে যুগে প্রবাহিত হয়ে আজও ভারতের কোটি কোটি দরিদ্র গ্রামবাসীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মেটাচ্ছে।

এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান অবলম্বন হোলো নানাপদ্ধতির গান, কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, ব্রতকথা ইত্যাদি। যদিও সাধারণ ভাবে সব কটিতেই শাস্ত্রকথা ও ধর্মকথারই প্রাধান্য, তবুও ঐ সব ধর্মকথার ভিতর দিয়ে তারা অতিসুন্দর সরস করে মানুষের জীবনের কি ভালো, কি মন্দ, কি করা উচিত, কি অনুচিত, কিসে সমাজের উন্নতি হয় সেই সব কথাই জনগণকে শুনিয়েছে। নানা রকমে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন-কথা ধর্মচ্ছলে বার বার বলেছে। আবার এও শুনিয়েছে যে, বীরের মত বাঁচতে হলে কি ভাবে মানুষকে বলশালী হতে হয়। দৈহিক ও মানসিক, উভয় বলের বিষয়ে সুন্দর উপদেশ তারা রেখে গেছে। অর্থাৎ লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়ার যে কথা আজকালের শিক্ষায় বার বার বলছে, সেই মানুষ হয়ে সমাজ ও দেশকে কি করে বড় করতে পারা যায় প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির ঐ ছিল মূল কথা। তখনকার শিক্ষাপদ্ধতিতে ধর্মের সঙ্গে বিরোধ ছিল না, তখনকার সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মচিন্তাকে অবশ্য শিক্ষণীয় বলে মনে করেছে। ভারতবর্ষ জীবনের সব দিক দিয়েই ধর্মকে জড়িয়ে ছিল কেন, সে কথাটা ভাববার বিষয়। তারা বুঝেছিল সাধারণত মানুষের কতকগুলি পশু-সুলভ প্রবৃত্তি আছে—যার জন্যে হিংসা, দ্বেষ, যুদ্ধ ইত্যাদি নানাপ্রকার পশু-সুলভ কাজ মানুষ সর্বদাই করে। ভারতীয় চিন্তাশীলেরা দেখেছিলেন এই প্রবৃত্তি থেকে মানব-সমাজকে বাঁচতে হোলে ধর্মচিন্তা হোলো তার একমাত্র ওষুধ। তাই তাঁরা মানুষের প্রতিদিনের জীবন-ধারার সব কিছুতেই ধর্মের কাঠি ছুঁইয়ে রেখেছিলেন। সেই জন্যেই প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সবটাতেই আছে ধর্ম বা অধ্যাত্মচিন্তার স্পর্শ। সুতরাং গ্রামের তথা সমাজের সঙ্গীত, চিত্র,

কাব্য ও নৃত্যে যদি আমরা ধর্মের প্রভাব দেখি তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এটাই হোলো ভারতের আসল স্বরূপ।

এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ বলে একটা কথা উঠতে পারে—তার সঙ্গে ধর্মের সামঞ্জস্য হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এর উত্তরে বলবো, বিজ্ঞানের প্রাণস্পন্দন মানব-সমাজের প্রাণস্পন্দন থেকেই শুরু হয়েছে। হঠাৎ এ যুগেই বিজ্ঞান আবির্ভূত হয়নি। এ যুগে জন্মে অতীতের দিকে ফিরে তাকালে মনে হবে, অতীত এ যুগের তুলনায় বিজ্ঞানে শিশু। কিন্তু বিজ্ঞানের সে যুগকেই তখনকার মানুষ মনে করতো শ্রেষ্ঠ যুগ। এখন আমরা বিজ্ঞানের যে বিরাট প্রভাবের মধ্যে বাস করছি, আরো কয়েক শতাব্দী পরে একেও তখনকার মানুষের কাছে নিশ্চয়ই অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বলেই মনে হবে। প্রাচীন ভারত সে যুগের বিজ্ঞানকে স্বীকার করেও তার সঙ্গে অধ্যাত্মচিন্তার বিরোধ দেখেনি। বৌদ্ধযুগে নাগার্জুনের মত সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হোতো না, যদি না ধর্মবিশ্বাসকে তাঁরা বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে শিখতেন। নিছক চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রাচীনকালে বেদেরই একটি অংশ বলে গৃহীত হয়েছিল। যাকে আজকাল আমরা বলি যৌনবিজ্ঞান তাকে ঐ কারণেই বলেছে কামশাস্ত্র এবং তার রচয়িতা হলেন ঋষি বাৎসায়ন। নৃত্যগীতের উৎপত্তির কারণ কেন মহাদেব ও সঙ্গীতের বইকে কেন শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁরা বলেছেন তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এই হোলো ভারতীয় সাংস্কৃতিক ধারার একটি বড় দিক, এবং এই জন্যেই ভারতবাসী এত ধর্মভীরু। সুতরাং ভারতীয় লোকনৃত্য বা পল্লীনৃত্যকে বুঝতে হলে প্রথমেই এই গোড়ার কথাটি প্রত্যেক ভারতবাসীকে জানতে হবে।

ভারতীয় গ্রামীণ-নৃত্যের মধ্যে প্রধান ও সবচেয়ে বেশী প্রচলিত হোলো দলবদ্ধ সামাজিক নৃত্য। মানুষ চায় জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে, তেমনি মানুষের সমষ্টি যে সমাজ সেও চায় নিজেকে সুন্দর

করে প্রকাশ করতে। সমাজের সুন্দর হওয়ার অর্থ হোলো—বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করা, নানা বিপরীত-গামী মনোবৃত্তিকে একটি ছন্দোময় শৃঙ্খলার মধ্যে গ্রথিত করা। একত্রে এক গ্রামে বাস করতে হলেও মানুষকে অনেক রকম নিয়মের মধ্যে চল্‌তে হয়। এমন কি গ্রামের বাসস্থানগুলিকে, চলাফেরার রাস্তাঘাটকে এমন ভাবে সাজাতে হয় যেন সমগ্র গ্রাম রচনার মধ্যে একটা ছন্দ থাকে। কোথাও যেন বিরোধ না দেখা যায় কোন দিক থেকে। সমাজের ঐ বস্তুর মধ্যে ঐক্য রচনার প্রধান ও সুন্দর উপায় হোলো নৃত্যগীতবাদ্য। সেই জন্যেই সামাজিক নাচ হোলো সমাজকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার একটি প্রধান অবলম্বন। সামাজিক নৃত্যের এই হোলো প্রকৃত উদ্দেশ্য। ভারতের পল্লীগ্রামে এর কাজ আরো সার্থক হয়ে মানব-সমাজের কল্যাণকে পরিস্ফুট করেছে।

প্রথমেই বলেছি আমাদের দেশের প্রায় সব নাচই ধর্মের আঁচল ধরে চলে এসেছে, গ্রামীণ-নৃত্যও তা থেকে বাদ পড়েনি। গ্রাম-সমাজের নাচ সর্বদাই ধর্মের সঙ্গে জড়িত। পূজা-অর্চনার পর নাচ, পর্ব বিশেষে দেব-দেবীকে লক্ষ্য করে নাচ, যেমন দেখা যায় তেমনি দেখি আগেকার দিনের ডাকাতরা, লাঠিয়ালরাও তাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করবার আগ্রহে যে নাচে নিজেদের মনকে সতেজ করতো, সে অনুষ্ঠানেরও পুরোভাগে অধিষ্ঠিত থাকতেন দৈহিক ও মানসিকশক্তি-দাত্রী কোন দেব বা দেবী। ভারতের কোন অঞ্চলে এমনও সামাজিক নাচ ছিল জানি, যেখানে বিবাহিত নরনারীর প্রবেশ নিষেধ। সে নাচে কেবল থাকবে বার-তেরো বৎসরের অবিবাহিত বালিকা ও আঠারো-উনিশ বৎসরের অবিবাহিত যুবকের দল। সেই নাচের উপলক্ষ হচ্ছে বিবাহের জন্য মনোমত পতি ও পত্নী নির্বাচন। সেখানে একমাত্র বয়স্ক বিবাহিত যিনি থাকেন পত্নীসহ—তিনি হলেন গ্রামের পুরোহিত। তাঁর কাজ হোলো নৃত্যারম্ভের পূর্বে শালগ্রাম শিলার

সামনে মন্ত্রপাঠ ও পূজা পরিচালনা করা। আরম্ভে মন্ত্রপাঠ ও গানের পর কন্যারা নৃত্য আসরে ভাগে ভাগে প্রবেশ কোরে শাল-গ্রামের সামনে নাচে। নাচ শেষ হলে শুরু হয় যুবকদের নাচের পালা। মেয়েদের সময় ছেলেরা ভালো করে তাদের নাচ দেখে, ছেলেদের নাচের সময় মেয়েরাও ছেলেদের নাচ দেখে। এই নাচ দেখার অবসরে উভয় দলই মনে মনে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী নির্বাচন করে। তারপরে শালগ্রামকে প্রণাম কোরে পুরোহিতদের আশীর্বাদ নিয়ে যে যার আপনার বাড়ীতে নিজেদের অভিভাবককে জানায় তাদের নির্বাচনের কথা। কিন্তু মনের সেই গোপন পছন্দ তারা নৃত্য-আসরে কখনো প্রকাশ করতে চায় না, কারণ তাতে শালগ্রাম শিলার সম্মুখস্থ নৃত্য-আসরের শুচিতা নষ্ট হবার শঙ্কা থাকে।

ইয়োরোপের শহুরে ধনী-সমাজের নাচ হোলো বল্-নাচ। এই নাচেই সমস্ত ইয়োরোপীয় সামাজিক নাচের আদর্শটি ধরা পড়ে। সে দেশের গ্রামের সমাজের নাচও ঠিক ঐ আদর্শে পরিচালিত। সে দেশের সামাজিক নৃত্যের মূল লক্ষ্য হলো পুরুষ ও নারীর সহজ-মিলনের মধ্যে যে সঙ্কোচ বা ব্যবধান দেখা যায় তাকে দূর করা। এক পুরুষ অপর পুরুষের সঙ্গে যে ভাবে বিনা দ্বিধায় মিশতে পারে, নারীর সঙ্গে পুরুষেরও সেইরূপ একটি মিলন সম্ভব হোক— ইয়োরোপের সামাজিক নাচগুলির সর্বত্রই এই লক্ষ্য।

সামাজিক নাচে ভারতবর্ষ কোনদিনই এ আদর্শের পক্ষপাতী নয়। আমাদের দেশেও অনেক নাচে পুরুষ ও নারী সহজ মিলনের ক্ষেত্র রচনা করেছে, কিন্তু সেখানে মেয়ে পুরুষকে একই চোখে দেখেনি। ভারতীয় মেয়েদের স্বাভাবিক নম্রতা নষ্ট হোক এটা ভারতের দৃষ্টিতে ভালো মনে হয়নি।

হয়তো অনেকে বলবেন যে, ভারতে নারী-স্বাধীনতার অভাব

হেতু সামাজিক নৃত্যে মেয়েপুরুষের সহজ মিলনে এত সঙ্কোচ ও বাধা। কিন্তু দেখি, মেয়েদের স্বাধীনতার সেই প্রাচীন যুগে ভারতে যে সব সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাতে সামাজিক নাচের বর্ণনায় ঐ প্রকার নাচের উল্লেখ দেখি না। রাধাকৃষ্ণের রাস-নৃত্যের বর্ণনায় প্রেম-বিহ্বল সহস্র গোপীর সঙ্গে সহস্র কৃষ্ণের নাচের পরিচয় ফুটেছে। যদিও এ নাচ দলবদ্ধ নাচ, কিন্তু এ প্রকাশ্যে নাচবার সামাজিক নাচ নয়। এ হোলো সমাজের নিয়ম-লঙ্ঘিত গোপন মিলনের নাচ। মানুষের সমাজে ভারতবাসী এ নাচকে ঘৃণাই করবে। ভারতের কোন কোন প্রদেশে মেয়ে পুরুষের দলবদ্ধ নাচ দেখা যায়। কিন্তু হাল্কা প্রেমের হাবভাব তাতে একেবারেই নেই।

হিন্দু সমাজ ছাড়া, ভারতের অন্যান্য প্রাচীন সমাজের মধ্যেও নৃত্যে নারীপুরুষের ঐ ব্যবধান উল্লেখযোগ্য। তাদের সামাজিক নাচের গতি ভারতের অন্যান্য সামাজিক নাচের সঙ্গে এক আদর্শে চালিত। তাদের নারীপুরুষের সহজ জীবনযাত্রায় যে-স্বাধীনতা দেখি তাতে তাদের সমাজে ইয়োরোপের আদর্শে সামাজিক নাচ হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তবুও তা হয়নি।

আমাদের দেশের মেয়েদের নাচে দেখা যায় ধ্যান-সমাহিত নৃত্যাবেগ—যাকে আমরা উপভোগ করি সংযত চিত্তের সাহায্যে। আমরা প্রেমোন্মাদনার মত্ততার আনন্দকে বড় করে দেখি না। এই হোলো আমাদের কাম্য।

এ যুগে অধিকাংশ রঙ্গমঞ্চের লোকনৃত্যের দিকে এবারে যদি দৃষ্টি দিই তাহলে দেখতে পাবো যে, সেখানকার প্রায় সব লোক-নৃত্যের মধ্যে নারী পুরুষের মিলনের দৃশ্য হুবহু ইয়োরোপের আদর্শে গঠিত—তা সে ধান-কাটা নৃত্যই হোক, সাঁওতাল-নৃত্যই হোক, আর কোন প্রাদেশিক নৃত্যই হোক। দেখতে পাবো মেয়েদের চপল চঞ্চল হাল্কা প্রেমের হাসি, নানা প্রকার মুখ ও চোখের ভঙ্গীতে।

'ভারতীয়' শহরের রঙ্গমঞ্চে আরো নানা রকমের লোকনৃত্য দেখেছি; কিন্তু সে নাচ রচনা হয়েছে দেশের নামে বিদেশী আদর্শে পুষ্ট দেশী মনের কারখানায়।

সেই সঙ্গে 'লোকসঙ্গীত', 'লোকশিক্ষা' ও 'লোকনৃত্য' কথা-গুলোও আজ আমাদের দেশে খুবই প্রচলিত হয়েছে। ইংরেজ শাসনের পূর্ব যুগে কিন্তু আমাদের দেশে একথা নিয়ে লোকে বিশেষ মাথা ঘামাত না। আমরা লোকশিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদিকে আজকাল যে চোখে দেখি বা বুঝতে চেষ্টা করি, সে যুগে এ সবের প্রতি ঐ দৃষ্টিভঙ্গীর কোন প্রকাশ দেখা যায়নি।

আজকাল লোকশিল্প কথাটার যে অর্থ দাঁড়িয়েছে, তা হল এই যে, বর্তমান নাগরিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে থেকে যেসব শিল্প-কলার বিকাশ দেখা যায়, তার বাইরের সমাজের বাকী সব শিল্পীই 'লোকশিল্পী' অর্থাৎ যা হ'ল নগরের বাইরের গ্রামবাসীদের স্বতঃ-উৎসারিত প্রেরণায় উদ্ভূত শিল্পকলা এবং এই শিল্পকলা নগর-সমাজ থেকে উদ্ভূত শিল্পকলার চেয়ে যে নিম্নস্তরের,—এই রকমের একটা মনোভাব নগরবাসী সমাজের মধ্যে প্রবলভাবে বিরাজ করছে। শহরের এই মনোভাবের দরুন এ যুগের গ্রাম-সমাজ বরাবরই মনে করে এসেছে যে, তারা যা কিছু রচনা করে, তা নগরসমাজের চেয়ে নিকৃষ্ট।

কিন্তু এ মনোভাব ইংরেজ-পূর্ব যুগে ভারতে দেখা যায়নি। নগর ও গ্রামের মধ্যে এরকম ব্যবধান তখন ছিল না।

গ্রামসমাজের এই প্রাধান্য মুসলমান যুগ পর্যন্ত দেখা গেছে। তার ব্যতিক্রম প্রথম ঘটতে শুরু হল ইংরেজদের আমলে।

ইংরেজ যুগের নতুন সভ্যতার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের অভাবে গ্রামগুলি সংস্কৃতির বিকাশে নতুন কোন পথ দেখাতে পারল না, কিংবা পূর্ব যুগের মত কোনপ্রকার সুন্দর সমন্বয়ও এর ফলে ঘটল না।

যুগে যুগে ভারতের বাইরে থেকে পাওয়া নতুন নতুন চিন্তাধারার সমন্বয়ে গ্রামে গ্রামে যে সংস্কৃতির বিকাশ বড় হয়ে ভারতের নানা শিল্পকলাকে গৌরবান্বিত করেছিল, এ যুগের গ্রামে তেমনটি আর হোলো না।

আগের যুগে নগর যেমন নিবিড়ভাবে গ্রামের সংস্কৃতি বা সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত ছিল, এ যুগে নগরের সঙ্গে গ্রামের সেই প্রাণের যোগ না থাকায় নগর-কেন্দ্রিক নতুন সভ্যতা বা সংস্কৃতির যোগাযোগে গ্রামগুলিতে শিল্পক্ষেত্রে সৃষ্টিমূলক পরিচয়ের অভাব ঘটল।

প্রাক-ইংরাজ যুগ পর্যন্ত গ্রামকে কেন্দ্র করে ভারতীয় শিল্পের সামান্যতম বিকাশ থেকে উচ্চাঙ্গের বিকাশের যে ব্যাপক নমুনা আজও আমরা দেখি তাতে আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের আমলে যে ধনকেন্দ্রিক নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠল, তাতে পূর্বের গ্রামসমাজের মত শিল্প বিকাশের এমন ব্যাপক রূপ আজ পর্যন্ত ফোটেনি। গ্রামের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে শিল্পের মাধ্যমে নানাস্তরের মানুষের মনের সহজ বিকাশের যে উপায়গুলি নির্ধারিত হয়েছিল, ভারতের বর্তমান নাগরিক সভ্যতার জন্যে সে ভাবের কোন নতুন উপায় দেখা গেল না। তাই নগরসমাজে বহুদিন যাবৎ শিল্পের বিকাশে সৃজনীশক্তির পরিচয়ের অভাব দেখা গিয়েছিল। চারুশিল্প, কারুশিল্প ও নৃত্যকলায় তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেবলমাত্র সঙ্গীতের বেলায়ই এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। চারুশিল্প, কারুশিল্প ও নৃত্যকলার উচ্চ বিকাশে বিদেশীর কলা-আদর্শই যে শ্রেষ্ঠতর, একদিন নগরবাসী সমাজে এই চিন্তা খুব দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপকভাবে শহরের সমাজে বিদেশী আদর্শপুষ্ট ঐ সব শিল্প স্থান পেল না। মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবিশেষের প্রাণপণ অনুকরণের মধ্যে তা নিঃশেষিত হতে দেখা গেল। সেই কারণে তাকে সমগ্রভাবে দেশের খাঁটি প্রাণজাত সম্পদ বলা চলে না।

নগরবাসীরা সেই সব বিদেশী আদর্শজাত শিল্পকে বিদেশাগত অন্যান্য বিষয়ের মত উচ্চশ্রেণীর সৃষ্টি মনে করে শ্রদ্ধার সঙ্গে তারই চর্চায় মনোনিবেশ করাতে গ্রামজাত প্রাচীন শিল্পধারার কিছুই গ্রহণ করতে পারল না। গ্রামজাত শিল্পকে এইরূপ অবহেলার চোখে দেখার দরুন তাদের কাছে গ্রাম ছোট হয়েই রইল। এর থেকেই নগরবাসী শিক্ষিতদের মুখে উদ্ভূত হোলো, নগরজাত শিল্পপ্রভাবহীন 'লোকশিল্প' কথাটি।

পূর্বকালে গ্রামসমাজে যে ধরনের উচ্চস্তরের শিল্পকলার ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল, নাগরিক সভ্যতা-প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল, রয়ে গেল কেবলমাত্র প্রথম স্তরের বহুবিধ সহজ ও স্বতঃ-উৎসারিত প্রাণবান শিল্প-সম্পদ। নগরসমাজে গ্রামসমাজের মত এইরকম উচ্চস্তরের শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ত দেখা গেলই না, এমন কি প্রথম স্তরের বিকাশও নয়। পূর্বেই বলেছি বিদেশাগত শিল্পের চর্চাও যা হয়েছিল, ভারতীয় সমাজজীবনের কোন স্তরেই তা ব্যাপকভাবে স্থান গ্রহণ করতে পারল না। অথচ এই মুষ্টিমেয় নগরবাসীদের অবজ্ঞার দৃষ্টিই গ্রামের শিল্পকে ছোট করে দেখার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী।

'লোকশিল্প' কথাটির দ্বারা যে ক্ষুদ্র অর্থে আজ গ্রামশিল্পকে আমরা দেখছি, প্রকৃত গ্রামশিল্প মোটেই তা ছিল না। এই গ্রামশিল্পীদের সাহায্যেই গ্রামে গ্রামে অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শনস্বরূপ মন্দির, দেওয়ালচিত্র, পট, প্রাচীন পুঁথির পাটায় ও পাতায় আঁকা ছবি, দগ্ধ মৃৎফলকে ও প্রস্তরে উৎকীর্ণ বিচিত্র নক্সার কাজ ও মূর্তি, গীত, অভিনয় ইত্যাদি নানা ধরনের শিল্পসম্পদ গড়ে উঠেছিল। সেগুলিকে আমরা কেন যে লোকশিল্প বলব না, তা বুঝতে পারি না।

কেন জানি না, নগরবাসী আমরাই এই সব উচ্চশ্রেণীর শিল্পকে গ্রামজাত শিল্পনিদর্শনের দল থেকে বাদ দিয়েছি। তাকে লোকশিল্প

বলছি না। অথচ এরাও সত্যিকার লোকশিল্প। হাজার হাজার গ্রামশিল্পীর শিল্প-সৃষ্টির নিদর্শন। সুতরাং ভারতবর্ষে আজ তথাকথিত শিক্ষিত আমরা লোকশিল্প কথার দ্বারা যা বোঝাতে চাচ্ছি, স্থিরভাবে বিচার করলে তার সত্যিকার কোন মূল্য নেই। লোকশিল্প সবই। পূর্বে ভারতীয় সমাজে শিল্পচর্চায় উচ্চ-নীচ ভেদ বলে কিছু ছিল না।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা যদি ভারতীয় নৃত্যকলাকে বিচার করি তা হলে দেখতে পাবো যে আজকাল গ্রামে উচ্চ-নীচ সব নাচই লোক-নৃত্য। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে গ্রামের পুরুষ ও নারীর যে কোন সহজ সাধারণ ছন্দের ও ভঙ্গীর দলবদ্ধ নাচ থেকে মণিপুরী, দক্ষিণ দেশের কথাকলিজাতীয় নানারূপ উচ্চাঙ্গের নৃত্যাভিনয় এ যুগের নগর-শিক্ষার নাগালের বাইরের গ্রামশিল্পীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এবং বিশেষভাবে গ্রামের জনসাধারণের মধ্যেই প্রচলিত। এ গ্রামেরই শিল্প। উচ্চশ্রেণীর শিল্প হলেও তাকে অনায়াসে লোকশিল্প বলা যায়।

ভারতের বিভিন্ন ধরনের লোকনৃত্যে পরিচয় লাভের জন্য ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসব উপলক্ষে দিল্লীতে গত কয়েক বছর যাবৎ অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভারতীয় লোকনৃত্যের একটি বিরাট সম্মেলন হয়ে আসছে। এই উপলক্ষে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ থেকেই প্রতি বছর কয়েকশত গ্রামবাসীর সমাবেশ হয় বিভিন্ন প্রকারের দলবদ্ধ নৃত্যের অনুষ্ঠানের জন্যে। কিন্তু এরা পেশাদারী নৃত্যসম্প্রদায় নয়। এরা হোলো সাধারণ গৃহস্থ ঘরের নরনারী। এদের অধিকাংশেরই জীবিকা হোলো চাষবাস। বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক সরকার এদের নির্বাচন করে পাঠান। সরকারী কর্মচারীদের উপর এদের ভার থাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার, নিয়ে আসার, সেখানকার কার্যসূচী অনুসারে তাদের তৈরি করে নেওয়ার ও সেখানে তাদের দেখাশোনা করার। দিল্লীর সুপরিচিত 'তালকাটোরা-

বাগ' অঞ্চলের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এদের তাঁবুতে রাখা হয়। দিল্লীতে পৌঁছানোর পর এদের থাকা খাওয়া ও সুখ-সুবিধার যাবতীয় দায়িত্বভার পড়ে ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের উপর। আর নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদির সব ব্যবস্থা করেন দিল্লীর সঙ্গীত-নাটক আকাদমি। দু' তিন দিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে হাজার হাজার দর্শকের সামনে।

এটি একটি বিরাট ব্যাপার। প্রত্যেক দলে থাকে ৩০ থেকে ৫০ জনের মত নরনারী। ভারতের নানা প্রদেশাগত বহুশত গ্রামবাসীদের এই নৃত্য উৎসব দেখে প্রথমেই যা আমার মনে এসেছে সে কথাটা বলে নিই।

আমরা ভারতের অনেক রকমের সম্মেলন দেখি। তাতে অনেক রকমের লোকের সমাবেশ হয়। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত শহরের অধিবাসীদের সম্মেলন এক ধরনের। যেমন সাহিত্য সম্মেলন, দর্শন সম্মেলন, বিজ্ঞান সম্মেলন, ইতিহাস সম্মেলন ইত্যাদি। আরও এক ধরনের সম্মেলন আমাদের দেশে শিক্ষিতরা চালু করেছেন অনেক বছর ধরে, তা হোলো দেশের রাজনৈতিক দলের সম্মেলন। যেমন কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন। এ ছাড়া, আর এক ধরনের অতি প্রাচীন প্রথায় খাঁটি ভারতীয় সম্মেলন যুগ যুগ ধরে আপনা থেকেই আমাদের দেশে চলে আসছে, তাকে বলা চলে ধর্মীয় সম্মেলন। তার উদাহরণ হোলো ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছোট বড় নানাপ্রকারের "মেলা"গুলি।

এই তিন প্রকারের সম্মেলনের মধ্যে কেবলমাত্র প্রাচীন পদ্ধতির মেলাগুলির দৌলতে বা তারই প্রেরণায় ভারতের নানা শহরে ও গ্রামাঞ্চলের ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই এক জায়গায় মিলিত হয়। এই মেলার কল্যাণে নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান তারা আহরণ করার সুযোগ পায়। এই কারণে এই মেলাগুলিকে

ভারতীয় লোকসমাজের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার এক চমৎকার উপলক্ষ বলে মনে করি। সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে এইসব মেলা যে কতরকমে উপকার ও আনন্দের বিষয় হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু ইংরেজ শাসনের যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীরা আর যে সব সম্মেলনের প্রচলন করলেন, যাকে আমরা আজকাল ইংরেজী ভাষায় বলি কন্‌ফারেন্স বা কংগ্রেস, সেগুলি কোনদিনই গ্রামবাসীদের জন্যে ছিল না, আজও নেই। কয়েকশত শিক্ষিত শহরবাসীর বিশেষ সম্মেলন সেগুলি। মহাত্মাজীর চেষ্টায় যখন থেকে কংগ্রেস অর্থাৎ জাতীয় মহাসভার অনুষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে বসবে বলে স্থির হোলো তখনই প্রথম শহরবাসী শিক্ষিতের সঙ্গে একমাত্র সেই অঞ্চলের গ্রামবাসীদের মিশবার সুযোগ হোলো। কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা তাতে আসতে পারেনি। তাদের দূর দূর প্রদেশ থেকে আনবার সেরকমের কোন চেষ্টাও হয়নি। ১৯৪৮ সালের জয়পুর কংগ্রেসের সময় একবার সে চেষ্টা হয়েছিল সর্বোদয় প্রদর্শনীর দ্বারা পরিচালিত সর্বভারতীয় লোকনৃত্য, গীত ও অভিনয়ের সম্মেলনে। পর বৎসর থেকে তা বন্ধ হয়ে যায়।

মোট কথা, বৃটিশ শাসনের যুগ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর এ-পর্যন্ত অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের ভারতের নানা অঞ্চল থেকে বিশেষ করে এনে নিয়মিত কোন সম্মেলনের চেষ্টা শিক্ষিত শহরবাসী বা সরকার থেকে কখনো হয়নি। সুনিয়ন্ত্রিতভাবে তার প্রয়াস প্রথম দেখা গেল ১৯৫৩ সালের ২৬শে জানুয়ারীর প্রজাতন্ত্র দিবসের লোক-নৃত্য উৎসবকে উপলক্ষ করে সরকারীভাবে। প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবের কার্যসূচীতে দলবদ্ধ লোকনৃত্যকে স্থান দেবার কথা চিন্তা করেছিলেন এবং নানা অসুবিধার মধ্যে সেই বছরেই একে উৎসবের কার্যসূচীর একটি প্রধান অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহী হয়েছিলেন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী, এবং এর জন্যে তিনি দেশবাসীর

সত্যিই ধন্যবাদের পাত্রী। এছাড়া প্রতিবৎসর এই উৎসব উপলক্ষে প্রত্যেক প্রদর্শনীতে নিয়মিত তিনি ও তাঁর পিতার যোগদান, প্রদর্শনীর শেষে গ্রামবাসীদের পরিচয় গ্রহণ, নিজের বাসস্থানে জলযোগে তাদের নিমন্ত্রণ করে, তাদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার আনন্দে মেতে ও তাদের আনন্দ দিয়ে উভয়ে সকলের মধ্যেই প্রেরণা জুগিয়েছেন। আমার মনে হয়, পিতা ও কন্যার এইদিকে আন্তরিক আগ্রহ আছে বলেই গ্রামবাসীদের নিয়ে এইরূপ বিরাট এবং অপূর্ব অনুষ্ঠান এমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং সঙ্গীত-নাটক আকাদমি ও ভারতের দেশরক্ষা বিভাগের কর্মীরা এতবড় গুরুদায়িত্বভার বহনে সাহসী ও সক্ষম হয়েছেন।

এই বিরাট নৃত্য উৎসবের আয়োজনে গ্রামবাসীরা কিভাবে উপকৃত হোলো তা নিয়েও আলোচনা করবার আছে।

উৎসবে নানা স্তরের, নানা ভাষার ও নানা প্রদেশের গ্রামবাসীদের সমাগম হয়। এই গ্রামবাসী নরনারীদের মধ্যে অধিকাংশই তাদের সমাজ, তাদের জেলা, তাদের ভাষা ছাড়া তার বাইরে যে কি আছে তার কিছুই জানতো না, কোনদিন যে তা জানতে পারবে তাও তারা ভাবেনি। তারা কোনদিন অনুভবও করেনি যে, ভারতবর্ষ কত বড় দেশ এবং কত বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি ও মানুষের লীলাভূমি। সেখানে আসতে গিয়ে তারা প্রথম তা অনুভব করতে শিখল। দিল্লীতে পৌঁছে এবং 'তালকাটোরাবাগে' বাস করে দেখল কত বিচিত্র ভাষার নরনারী, কত বিচিত্র সাজ তাদের ও কত বিচিত্র তাদের দেহের গড়ন। সেই সঙ্গে আরো দেখল ভারতের নানা অঞ্চলের বিচিত্র ঢংয়ের গান ও সুরের সঙ্গে বিচিত্র তালের ছন্দে নানা ভঙ্গীর নাচ। এইখানেই এই উপলক্ষে এসে তারা অন্তরে অন্তরে অনুভব করল যে, তারাই একমাত্র ভারতবাসী নয়, তাদের নাচই একমাত্র ভারতের নাচ নয়, তাদের গানই ভারতের একমাত্র গান নয়, তাদের ধর্মই

ভারতের একমাত্র ধর্ম নয় এবং সাজে পোশাকে, আচারে ব্যবহারে, কথায় ভাষায় ভারতের নরনারী সবই এক নয়। এইসব বৈচিত্র্য নিয়েই ভারতের সম্পূর্ণতা। এ নিয়েই ভারতের প্রকৃত পরিচয় ফুটে উঠেছে। এই অনুভূতির কথা তারা নিজেরা হয়তো মুখে প্রকাশ করে বলতে পারবে না কিন্তু মনের অগোচরে তারা জেনে গেল, অনুভব করে গেল ভারতের এই সত্য রূপটিকে। এ শিক্ষার মূল্য তাদের জীবনের পক্ষে যে কতবড় জিনিস তা বলে বোঝানো কঠিন।

লোকনৃত্য উৎসবে কেবল যে গ্রামবাসীরাই উপকৃত হচ্ছে তা নয়। এদের এই সম্মেলনে দর্শক হিসেবে যোগ দিয়ে শহরবাসীরা কিভাবে লাভবান হচ্ছে সেকথাও আমাদের ভেবে দেখা উচিত। তারাও গ্রামবাসীদের মত ভারতের নানা বৈচিত্র্য ও বিশালতার পরিচয় পাচ্ছে এইসব গ্রামবাসীদের সাজ-পোশাক, কথাবার্তা, গানের সুর ও নাচের ছন্দের ভিতর দিয়ে। এছাড়াও আরো যে একটি বড়রকমের উপকার করছে এই নৃত্য সম্মেলন, তার কথাও একটু বিস্তারিতভাবে এখানে আলোচনা করতে চাই।

ভারতে অপেশাদারী দলবদ্ধ লোকনৃত্যের প্রবাহ যুগ যুগ ধরে বয়ে এসেছে। গ্রামাঞ্চলে সে প্রবাহ স্বতঃ-উৎসারিত প্রস্রবণের মত সচল। কিন্তু আমরা যারা গ্রামের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরে থাকি বহুদিন পর্যন্ত তাদের খবর নিইনি। আমরা ভারতের নানা অঞ্চলে বেড়াতে যাই কিন্তু সেখানকার গ্রামজীবনের পরিচয় নেবার চেষ্টা করি না। সেখানকার গ্রামের অধিবাসীদের নাচ গান যে কি, তার মূল্য বা তা শিল্পজাত স্তরের জিনিস কিনা তার কিছুই জানিনি। এই ছিল গত চল্লিশ বছর পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষিত শহরবাসীদের লোক-নৃত্যগীত বিষয়ের জ্ঞান। ইংরেজ অধিকারের যুগে গঠিত ভারতের শহরবাসী সমাজের জন্যে কোন নাচ ছিল না। তারা গ্রামসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাতে গ্রামেরও কিছু নিতে পারেনি। নিজের সমাজের

মত করে নতুন কোন ধারার নাচও তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। নাচে তারা ছিল সম্পূর্ণ নিঃস্ব। এই নিঃস্বতার কথা শহরের মানুষ অনুভব করে প্রথম, চল্লিশ বছর আগে। নিজেদের জন্যে নাচ রচনা করতে গিয়ে তারা দেখল যে, গ্রামের শরণাপন্ন না হ'লে তাদের আর কোন উপায় নেই। সেই থেকে, তাকে জানার ও শেখার আগ্রহ দেখা দিল। তবুও বলব, আজ এত বৎসর হতে চলল, গ্রামসমাজের মত নিজেদের সমাজের জন্যে কোন নাচ আজও শহরে দেখা দিল না। শহরের নাচের আন্দোলনে এখনো পর্যন্ত পেশাদারী নৃত্যের মনোভাব প্রবল। অর্থাৎ মুষ্টিমেয় একদলকে মঞ্চে নাচবার জন্যে তৈরি করাই যেন এই নৃত্য আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শহরের এইসব দল গ্রামের নাম করে এতদিন পর্যন্ত আমাদের অনেক রকমের নাচ দেখিয়েছে, অনেক রকমের নাচ রচনাও করেছে নতুন করে, কিন্তু গ্রামের লোককে কাছে ডেকে এনে নিজেদের নাচের পাশে তাকে স্থান দেয়নি। শহরে আমরা দূর থেকে তাদের প্রশংসা করেছি কিন্তু শহরে ডেকে এনে এক সঙ্গে তাদের নাচতে বলিনি। এছাড়া, আরেকটি দোষের কথা আগেই বলেছি, গ্রামের লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবনের নামে নিজেদের রুচিমত নাচ তৈরি করে তা শহরের দর্শকদের দেখাচ্ছি। নতুন সাজে সজ্জিত এই নাচ প্রশংসাও পেয়েছে। এর জন্যে বহু পরিমাণে দায়ী হচ্ছে ভারতের কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং এযুগের একদল পেশাদারী নৃত্যসম্প্রদায়। প্রজাতন্ত্র দিবসের এই বিরাট লোকনৃত্যের উৎসব উভয়দিকে আমাদের খুবই উপকার করেছে। তাদের সঙ্গে ভেদাভেদ দূর করে দিচ্ছে আর পরিষ্কারভাবে চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে, প্রকৃতই ভারতীয় গ্রামসমাজের দলবদ্ধ লোকনৃত্য কি জিনিস। যে কারণে দিল্লীর মত শহরে গ্রামসমাজের নামে ভেজাল দলবদ্ধ নৃত্যের অনুষ্ঠান

করে তাকে খাঁটি বলে দর্শকদের বোঝানো দিনে দিনে কঠিন হয়ে পড়ছে।

এই উৎসবে সব কটি নৃত্যদলকে দিল্লীর নৃত্যউৎসবের অনুষ্ঠানের জন্যে খানিকটা শিখিয়ে পড়িয়ে যে নিতে হয়েছিল তা বেশ ধরা পড়ে। যেমন, দলবদ্ধ লোকনৃত্যের গতি সাধারণত হয় গোলাকার কিংবা সামনে এগিয়ে বা পিছিয়ে। এই অনুষ্ঠানের অনেক দলই, বিদেশী প্রথায় কোরিয়গ্রাফীর বৈচিত্র্য আনতে গিয়ে একই নাচকে নানাভাবে সাজাতে চেষ্টা করেছিল। কখনো, পাশাপাশি দুই সারিতে দাঁড়িয়ে, কখনো দুই সারিতে সামনে পিছনে দাঁড়িয়ে, কখনো মেয়ের দল মাঝখানে গোল হয়ে নাচছে, বাইরে তাদের ঘিরে নাচছে ছেলেরা। কখনো মঞ্চের মাঝখান থেকে চার দলে চার কোণে ভাগ হয়ে গেল। কখনো ছেলেমেয়ে একজনের পর আর একজন কোমর ধরে; কখনো সেইভাবেই দু'জন দু'জন করে পিছনে দাঁড়িয়ে নানা ভঙ্গীতে ছন্দেতে নেচেছে। এইরকম নানা দল নাচের সময় নিজেদের সাধ্যমত নানা ভাবের বৈচিত্র্য রচনা করতে চেষ্টা করেছিল। শহরের দর্শকেরা অনেকেই এতে খুশী। কিন্তু তারা লক্ষ্য করেনি যে, নাচের প্রকৃত প্রাণ তাতে কতটা ব্যাহত হয়েছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, নিজেদের আনন্দের কথা চিন্তা না করে অপরের আনন্দের খোরাক হিসেবে সাজানোর চেষ্টা থেকেই এসব করা হয়েছে। এই ধরনের নতুনত্বে এ যুগের শহরের পেশাদারী নাচের প্রভাব যে পড়েছে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এবং জানতে পেরেছিলাম যে, এ পরিবর্তন নাচিয়েরা নিজেরাই করেনি, তাদের এইভাবে তৈরি করবার পরামর্শ দিয়েছিল শহুরে উদ্যোক্তারাই।

যে সব গ্রামবাসী নাচের সময় নিজেদের পূর্বপ্রচলিত সাজে সেজেছিল তাদের জামা-কাপড় পরার কায়দা ও রঙের বিন্যাসে সুন্দর একটি রুচি ও ছন্দবোধের পরিচয় ছিল। কিন্তু যেখানেই সরকারী

কর্মচারীরা সেই সাজের উপর হাত বুলিয়েছে, সেই খানেই তার অভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। রঙের ক্রুটিপূর্ণ বিন্যাস ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্ত্রের চাপেই তার নমুনা প্রকাশ পেয়েছিল।

বাইরের প্রভাবে গ্রামবাসীরা কতখানি পরিচালিত হয়েছিল তার দু' একটি উদাহরণ দিই। আসামের বোড়ো জাতীয় ছেলেমেয়েরা ফসল কাটার নামে একটি নাচ দেখাল। ছেলেদের ছিল হাতে কোদাল ও মাথায় বড় টোকো। আর, মেয়েরা ছিল এক হাতে জলের ঘটি, অপর হাতে কাঁসার থালি মাথায় রেখে। তারা কোদাল দিয়ে মাটি কাটা, মাটি ফেলা, মাটি তৈরি করা, ধান পোঁতা, ধান ঝাড়া, ভাত খাওয়া, জলের ঘটি থেকে জল নিয়ে হাত ধোয়া ইত্যাদি আরো কয়েক প্রকার অভিনয় দেখিয়ে গেল নাচের মধ্য দিয়ে। দেখে বেশ বোঝা গেল, শহরের প্রভাবে তারা এই নাচটি রচনা করেছে শহর-বাসীদের মুগ্ধ করবার ইচ্ছায়।

ভারতের গ্রামবাসীদের কৃষিপ্রধান জীবিকা হলেও এ ধরনের বাস্তবপন্থী অভিনয়যুক্ত নাচ ভারতে কোথাও নেই। এ জিনিসটির আমদানী করেন শহরের নর্তকসম্প্রদায়। ফসল কাটার বা Harvest Dance-এর চিন্তা শহরবাসীদের মাথায় প্রথম আসে বিদেশী নাচের প্রভাবে। সেই চিন্তাই ভারতীয় সাজে ভারতীয় টেক্‌নিকে ভারতবর্ষে রূপ নিয়েছে নতুন করে। এই নাচ শহরের দর্শকদের কাছে আজকাল খুবই পরিচিত কারণ তা হামেশাই হয়। কতটা পরিচিত তার নমুনা দেখেছি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দু' বছরের Inter. University Youth Festival-এর নৃত্যানুষ্ঠানে। বিচিত্র সাজে, বিচিত্র ঢং-এ এই Harvest Dance কলেজের ছেলে ও মেয়েদের বহু দলই দেখিয়েছিল। ক্রমাগত তাই দেখে বেশ একটু ক্লান্তি বোধ করেছিলাম। গ্রামে যে ধরনের নাচের চল আজ নেই তার পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন এখানে ওঠেই না। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐসব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে

যে-সমাজের কোন যোগ নেই তাকে অনুসরণ করে কিছু করতে গেলে তা খুবই অস্বাভাবিক ঠেকে। তারা নকল গ্রামবাসী সেজেছে। অথচ মুখ চোখের ইঙ্গিতে ও ভঙ্গীতে হাল্কা ও চপল ভাবের যে আনন্দ ফোটাতে চেয়েছে সেই ধরনের আনন্দের অভিব্যক্তি গ্রাম-সমাজে বিরল। এসব দেখে শুনে ক্রমাগতই মনে হয়েছে যে, ফসল কাটার নৃত্য শহরবাসীদের যেন একটা বিলাস মাত্র। আসামের বোড়ো জাতির সেই নাচ দেখে তাই দুঃখ বোধ করেছি। এ ধরনের প্রয়াস ১৯৪৭ সালে আসামের তদানীন্তন রাজ্যপালের চেষ্টায় শিলং-এ অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী আসামের লোক-নৃত্যগীতের উৎসবে বোড়োদের নাচে একেবারেই দেখিনি। এতদিন পরে তারা এইসব শুরু করেছে।

সেই একই উৎসব আসামের নাগাদের ও কেরলের পুরুষের নাচে যুদ্ধোচিত বীরত্ব ভাব ছিল খুবই তবুও তাতে নাচের ছন্দ প্রাধান্য পাওয়ার দরুন দর্শকদের কাছে তা আনন্দের বিষয় হয়েছে। শিকারের বা যুদ্ধের অঙ্গভঙ্গীর ইঙ্গিত তাতে ছিল কিন্তু তা নাচের ছন্দে মিশে হয়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এদিকে হায়দরাবাদের পুরুষ নর্তকের দল তলোয়ার, ছোরা, লাঠি, বন্দুক হাতে এমন অঙ্গভঙ্গী করে নাচল যে, তা দেখে তাদের দলকে খুব নৃত্যরসিক বলে মনে হয়নি। নাচের একস্থানে একজন আর একজনকে মাটিতে ফেলে ছোরার দ্বারা আঘাতের এমন নিখুঁত অভিনয় করল যে, তা দেখে আনন্দ ত দেয়নি, উপরন্তু হাসিরই উদ্রেক করেছে। এ ধরনের বাস্তবানুগ অভিনয়যুক্ত নাচ দিল্লীর লোকনৃত্য উৎসবের অনুষ্ঠানে কিছু কিছু হয়েছে। কিন্তু সেই সব নাচ কোনদিনই প্রশংসা পায়নি।

পূর্বেই বলেছি ভারতের গ্রামসমাজ এখনো পর্যন্ত ধর্মকেন্দ্রিক সমাজ। সেখানে নৃত্যগীতবাদ্যের সব আয়োজন হয় নানাপ্রকার পূজা পার্বণ ও বিবাহ ইত্যাদি উৎসবকে উপলক্ষ করে। কেবল

নাচতে ইচ্ছা করছে বলেই নাচ বা শহরের মত দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্যে নৃত্যানুষ্ঠান গ্রামসমাজে দলবদ্ধ নাচে প্রচলিত নেই। এই নাচের কোন বিদ্যালয় বা স্বতন্ত্রভাবে শেখাবার কোন ব্যবস্থা গ্রামসমাজে থাকে না। গ্রামে এই নাচ ছেলেমেয়েরা শেখে এইসব উৎসব সময় নাচ দেখে ও অতি শিশুকাল থেকেই উৎসবদিনে বড়দের সঙ্গে নাচে যোগ দিয়ে। অর্থাৎ নৃত্যগীতের এমন একটি জোরালো আবহাওয়া এইসব সমাজে গড়ে ওঠে যে, সেই আবহাওয়াই তাদের শিক্ষকের কাজ করে। ছোটকাল থেকে নিজেদের অজ্ঞান্তেই সেই নাচ শিখে নেয়। এদের নাচে প্রকাশ পায় সহজ আনন্দের একটা উচ্ছ্বাস ছন্দের দোলায় দোলায়িত দেহভঙ্গীর মধ্য দিয়ে। মুখে চোখে প্রকাশ পায় আপনভোলা একটি গভীর তৃপ্তির ভাব। এটিই হোলো ভারতীয় লোকনৃত্যের বড় সম্পদ। দিল্লীর নৃত্য-উৎসবে দু' একটি দলের নৃত্যে পুরুষ ও নারীর মুখে ও চোখে সেই ভাবটির অভাব লক্ষ্য করেছি। তারা আনন্দের নামে একটি চপল ভাবকেই প্রশ্রয় দিয়েছিল বিশেষ করে।

গ্রামের দলবদ্ধ নাচের আর একটি প্রধান গুণ হোলো বহুজনে মিলে একসঙ্গে, একতালে, একভঙ্গীতে, একসাজে নৃত্যে এক হয়ে যাওয়া। এই গুণগুলি যে দলের নাচে প্রকাশ পেয়েছিল তারাই এই নৃত্য উৎসবে পুরস্কৃত হয়।

এই নৃত্যউৎসবে যারা সাধারণত যোগ দেয় তাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিই।

১। অন্ধ্র :—

"সিদ্দী"—হায়দরাবাদ নিবাসী একই নামের আফ্রিকার নিগ্রো সম্প্রদায়ের পুরুষনৃত্য। হাতে বন্দুক, তলোয়ার ছোরা ও লাঠি নিয়ে যুদ্ধনৃত্য। গানের সঙ্গে ঢোল, নাকাড়া, বাঁশী ও একটি হুঁকোযন্ত্র ঝমঝম শব্দের জন্যে।

"লাম্বাডা" নামে হায়দরাবাদের একপ্রকার বেদিনী মেয়েদের নাচ। বাজনা হোলো ঢোল ও করতাল।

"মাথুরী" নাচে পুরুষদের হাতে থাকে কাঠি, মেয়েরা নাচে হাততালি দিয়ে। লাম্বাডা মেয়েদের মত সাজের জাঁকজমক খুব। একই প্রাঙ্গণে পুরুষদের দল ও মেয়েদের দল নাচে আলাদা।

২। আন্দামান, নিকোবার :—

"বড়দিন"—শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মিলিত নৃত্য। কেবল গান গেয়ে নাচে। গানে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের প্রভাব খুব।

৩। আসাম :—

"অফিলাকুব্"—এক সম্প্রদায়ের নাগা মেয়েদের খালিহাতে গানের সঙ্গে নাচ। গানগুলি ইয়োরোপের গানের অনুকরণে রচিত।

"তপুকিখিলে" হোলো বল্লমহাতে নাগা ছেলেদের নাচ। নিজেরা মুখে গান গায়। কোনপ্রকার তালযন্ত্র নেই।

"মিরি" নামে এক সম্প্রদায়ের যুবকদের নাচ ডানহাতে খাঁড়া নিয়ে। মুখে "ও" এবং "অই" শব্দ করে তালের ঝোঁকে ঝোঁকে।

"খুয়ালাম"—হোলো মিজো নামে এক সম্প্রদায়ের যুবক ও যুবতীদের মিশ্রনাচ। সঙ্গে বন্দুকধারী একজন পুরুষ থাকে। গান নেই। বড়, মাঝারি ও ছোট আকারের গঙ, ঢোল ও করতাল বাজে সঙ্গে।

সিদ্দী—অন্ধ্র

সিদ্দী—অন্ধ্র

কেরকু—নাগপুর

ডাণ্ডিয়ারাস—সৌরাষ্ট্র

গজে—সাঁতারা জিলা

"বিহু"—সমতলবাসী ছেলেমেয়েদের একত্র নাচ। সারিবদ্ধ নয়, এলোমেলো। নানাপ্রকার হাস্যকর অঙ্গভঙ্গী আছে। গান হয়। সঙ্গে বাজে ঢোল, মোষের সিংয়ের সানাই, করতাল ও চেরাবাঁশের তালযন্ত্র।

"হুরাইরঙ্গিলি"—নাচটি ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে করে। বিহু নাচেরই অঙ্গবিশেষ বলে মনে হয়।

"ফাইকিংলাম"—উত্তর কাছাড় জিলার পার্বত্য সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের নাচ। বাঁশী, ঢোল ও গঙ্গ বাজে সঙ্গে।

"মৈগৈনাই"—সমতলবাসী "বোড়ো" সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের মিলিত নৃত্য। বড় ঢোল, করতাল, সারিন্দা ও বাঁশী বাজে গানের সঙ্গে।

"বাগরোম্বা" মেয়েদের নাচ। কাঁধ থেকে দুই পাশে ঝোলান চাদর দুই হাতে মেলে ধ'রে নাচাই হোলো এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য। গানের সঙ্গে বাজে বড় ঢোল, করতাল, সারিন্দা ও বাঁশী।

৪। বোম্বাই :—

"ডাণ্ডিয়ারাস"—সৌরাষ্ট্র প্রদেশের পুরুষদের নাচ দুই হাতে কাঠি নিয়ে। গানের সঙ্গে বাজে বাঁশী, করতাল, তবলা বাঁয়া।

"মন্দিরানৃত্য"। পুরুষেরা দুই জোড়া ছোট মন্দিরা দুই হাতে নিয়ে গানের তালে তালে বাজিয়ে নানাপ্রকার নৃত্যভঙ্গী করে। বাজনা উপরিউক্ত নাচের মত। এটিও ঐ অঞ্চলের নাচ।

"টিপ্পনী"—ছাদপেটানো কাঠের দুরমুশ হাতে মেয়েদের নাচ। ঢোল, করতাল, সানাই বাজে গানের সঙ্গে। দুরমুশের সঙ্গে ঘুঙুর বাঁধা থাকে। এটিও সৌরাষ্ট্রের নাচ।

"সিদ্দি"—সৌরাষ্ট্রের জুনাগড় ও জাফরাবাদ নিবাসী আফ্রিকার নিগ্রো সম্প্রদায়ের নাচ। সারিবদ্ধ সুশৃঙ্খল নাচ নয়। বিভিন্ন আকারের ঢোল ও ঝুমঝুমির মত তালযন্ত্র বাজে গানের সঙ্গে।

"গরবা"—গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের মেয়েদের নাচ। হাতে তালি দিয়ে, তুড়ি দিয়ে বা কলসী নিয়ে নাচাই হোলো এর বিশেষত্ব।

"পাইপয়ানা"—চন্দাজেলার "মেদিয়া" সম্প্রদায়ের পুরুষ-নৃত্য। মাদল বাজে সঙ্গে।

"ব্রোচ্" জেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মেয়েদের মিলিত নৃত্য। বড় ঢোল ও নাকাড়ার মত বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে বাজে। শিঙ্গা বাজে নাচের তালে তালে।

"কেরকু"—নাগপুর অঞ্চলের এক পাহাড়ী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের মিলিত নৃত্য। ছেলেদের ডান হাতে থাকে কাঠের চাকতি দেওয়া করতাল, বাঁ হাতে সাদা রুমাল। সঙ্গে ঢোল ও বাঁশী।

গোয়া প্রদেশের ধানকাটার নাচ। পুরুষ ও মেয়েরা একসঙ্গে নাচে। এদের গানে ইয়োরোপীয় সংগীতের অত্যধিক প্রভাব। সঙ্গে বিদেশী যন্ত্র ট্রাম্পেট ও ক্লারিয়োনেট, বেহালা, হাঁড়ির মত বাদ্যযন্ত্র ও ঢোল।

ঝুমুর—বিহার

লাঝুরী—ছোটনাগপুর

কারগম্—মাদ্রাজ

পোনসালাম্—মণিপুর নাগা

"গজে"—সাতারা জেলার পুরুষনৃত্য। হাতে রঙিন রুমাল, বাদ্যযন্ত্র হোলো ঢোল, করতাল, বাঁশী বা সানাই।

"রাস"—সুরাট জেলার "মেহবো" নামে মহারাষ্ট্রীয় পুরুষ-নৃত্য। সৌরাষ্ট্রের ডাণ্ডিয়ারাসের মত কাঠিহাতে নাচে। ঢোল ও সানাই বাজে সঙ্গে।

৫। বিহার ঃ—

"লাঝুরী" ও "যাত্নুর"—ছোটনাগপুর অঞ্চলের ওঁরাও সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের একত্র নাচ। গানের সঙ্গে বড় মাদল, বড় করতাল বাজে।

"লুরিম্বরায়ু"—মানভূমের ছৌ-নাচের মত। পুরুষদের নাচ। বড় নাকাড়া, সানাই ও বাংলাদেশী ঢোল বাজে সঙ্গে গান ছাড়া।

"ঝুমুর"—পূর্ণিয়া জেলার ধাঙ্গড় সম্প্রদায়ের মেয়েদের নাচ। বাংলাদেশের সাঁওতালদের মত। মাদল, বড় নাকাড়া ও করতাল বাজে গানের সঙ্গে।

"শিকার নাচ"—ধলভূমের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের নাচ একসঙ্গে। বড় ঢোল, বড় নাকাড়া, শিঙ্গা ও করতাল থাকে সঙ্গে।

৬। হিমাচল প্রদেশ ঃ—

"বুরা" ও "রাস" নামে দুটি নাচ ছেলেমেয়েরা নাচে একসঙ্গে খালি হাতে। বড় আকারের ডমরু, খঞ্জনি, নাকাড়া বাজে গানের সঙ্গে। শিঙ্গা ও মন্দিরাও বাজে।

"বরদিন"—দেরাদুন জেলার জানসারবায়ার সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে নাচ। গানের সঙ্গে বাজে বড় ঢাক, নাকাড়া, শিঙ্গা ও করতাল।

"পাণ্ডব" ও "চৌফল কেদার"—তেহরি গাড়োয়াল অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের সমবেত নৃত্য। নাচিয়েদের একহাতে চামর ও একহাতে রুমাল। বড় নাকাড়া, ছোট নাকাড়া, ঢোল ও শিঙ্গা বাজে গানের সঙ্গে।

"সাংলা"—পার্বত্য মহাসু জেলার মেয়ে ও ছেলেদের মিলিত নৃত্য। সাজপোশাক, গানবাজনা সবই পার্বত্য অঞ্চল-বাসীদের উপরিউক্ত নাচগুলির মত।

৭। কেরল :—

"পুলয়রকলি"—পুরুষনৃত্য। একহাতে ছোট ঢাল ও একহাতে লম্বা কাঠি। যুদ্ধের নাচ। সুরে ছড়াকাটার মত গানগুলি। চেণ্ডাই নামে ঢোল বাজে, সঙ্গে কাঁসার ভারি করতাল।

"এলাকারাডি"—পালঘাট জেলার পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে নাচ। সঙ্গে বাজে ছোট আকারের সানাই, ঢোল ও বড় করতাল। মুখে মাঝে মাঝে উৎসাহব্যঞ্জক শব্দ।

"পুরাক্কলি"—সমবেত পুরুষনৃত্য। গানের সঙ্গে বাজে চেণ্ডাই নামে ঢোল ও করতাল।

৮। মধ্যপ্রদেশ :—

"গেদী"—কাঠের রণপার নাচ। ছেলেরা নাচে মাদল, বাঁশী ও ছোট নাকাড়ার সঙ্গে। গান নেই। রণপার প্রত্যেক ডাণ্ডার নিচ দিকে থাকে ঘুঙুর বাঁধা।

"ধুরিয়া"—রায়গড় অঞ্চলের করমা নামে আদিবাসী ছেলে-মেয়ের মিলিত নৃত্য। গানের সঙ্গে মাদল করতাল থাকে।

কাবুইনাগ—মণিপুর

কাবুইনাগ—মণিপুর

বালকৎ—মহীশূর

ইয়াক্—উত্তর-পূর্ব সীমান্ত

"সৈলারীণা"—গণ্ড সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মেয়েদের সম্মিলিত নাচ। গানের সঙ্গে বাজে কয়েক প্রকারের ঢোল, কাঠের করতাল, বাঁশী, কাঠের চাকতি লাগানো একপ্রকার তালযন্ত্র।

৯। মাদ্রাজ :—

"কারগম্"—মাথায় পর পর কয়েকটি কলসী বসিয়ে বাজনার তালে তালে নাচ। সঙ্গে ঢোল ও সানাই।

১০। মণিপুর :—

কাবুই নামে পার্বত্য অঞ্চলবাসী এক সম্প্রদায়ের নাগা ছেলেমেয়েদের নাচ। সঙ্গে গান করে। পুরুষদের হাতে থাকে কুঠার।

"টান্‌ডন্‌ফাইবক্"—নাচটি পুরুষ ও মেয়েদের মিলিত নৃত্য। মণিপুরী লাইহারোবা ও দোলের নাচের মত।

"আউগ্রীহাঙ্গলচোঙ্গবা"—একদল ছেলে ও মেয়ে হাত ধরে সার বেঁধে নাচে। অন্য দুটি পুরুষ এই নাচের সঙ্গে একজন অপরকে তাড়া করছে, এইরূপ অভিনয় করে। পলায়মান পুরুষটি সারিবদ্ধ নৃত্যদলের সাহায্যে ধাবমান পুরুষটির হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করে। একটি গল্প এই নাচটির পিছনে আছে।

"জোনই"—ছেলেমেয়েদের একত্র নাচ। গানের সঙ্গে বড় ঢোল, বড় গঙ্গ, বড় করতাল থাকে।

"পোন্‌সালাম্"—এক সম্প্রদায়ের নাগা স্ত্রী-পুরুষের একত্র নাচ। ঢোল ও বাঁশী বাজে গানের সঙ্গে। ছেলেদের হাতে থাকে কুঠার।

"খৈচক্"—যুদ্ধনৃত্য। ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে।

"রঙ্গলাম্"—ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে নাচে একপ্রকার পাখীর অনুকরণ ক'রে।

উচ্চাঙ্গ মণিপুরী নাচ লাইহারোবা, মৃদঙ্গ নাচ ও করতাল নাচ দেখানো হয়েছে।

১১। মহীশূর :—

"বালকৎ"—পুরুষনৃত্য। একহাতে চামর, অন্যহাতে লম্বা কাঠি। গানের সঙ্গে ও বাজনায় নাচ হয়।

"সুগ্গীকুণীতা"—পুরুষদের নাচ। ফসল-কাটা নৃত্য। ফসল রোপণ থেকে কাটা ও ফসল ঝাড়ার অভিনয় করে নাচে। শেষদিকে লম্বা কাটি হাতে নাচ দেখায়। নাচটি আধুনিক।

"পূরবী আট্যম্"—কাঠের ঘোড়া কোমরে বেঁধে বাজনার তালে ঘোড়ার চলার নানা ভঙ্গীর নাচ। নর্তকের দুইপায়ে বাঁধা থাকে ছোট কাঠের দুটি রণপা। রাজারাণীর বিষয় নিয়ে নাচের ছন্দে অভিনয় করে কাঠের-ঘোড়ায়-চড়া চরিত্রগুলি। বিলিতি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে ঢোলের তালে সার্কাসের কনসার্টের বাজনা বাজে।

"যক্ষগণ"—পুরুষদের একটি খ্যাতনামা উচ্চাঙ্গের অভিনয় নৃত্য।

১২। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত :—

"সংগটম্"—দলবদ্ধ পুরুষের নাচ বাদ্যযন্ত্র ছাড়া। তালে তালে মুখে "আ" শব্দ করে নর্তকরা। হাতে বল্লম ও কুঠার। শিকার বা যুদ্ধের ইঙ্গিত আছে নাচে।

"ইয়াক্"—পুরুষদের মুখোশ নৃত্য। শিংওয়ালা একটি বড় গরু সাজে দুজন পুরুষে। বাঘের মুখোশে এবং মানুষের মুখোশে আরো দুজন করে মোট চারজন। গান নেই। সানাইয়ের সুরই প্রধান। সঙ্গে বাজে শিঙ্গা, সানাই, করতাল, একটি চামড়ার বাদ্য, তার নিচের দিকে একটি ডাণ্ডা থাকে, বাঁ হাতে সেটি ধরে ডান হাতে কাঠিতে বাজাবার জন্যে।

"হরিণের নাচ"। শিংওয়ালা হরিণের মুখোশ-পরা একজন পুরুষ। আরো কয়েক প্রকার জন্তুর মুখোশে কয়েকজন। মুখোশ-পরা মানুষও আছে। বাজনা উপরিউক্ত "ইয়াক্" নাচের মত। গান নেই। সানাই প্রধান।

"সাদাটোপে ইৎসেন্"—হিমালয় বা তিব্বতের বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত নানা প্রকার মুখোশ-পরা পুরুষের নাচ। জমকালো সাজপোশাক। করতাল ও লম্বা এক প্রকারের শিঙ্গার শব্দ এই মুখোশ নাচের প্রধান অবলম্বন।

"জেলিয়াং"—কোহিমার ত্বেনসাং অঞ্চলের মেয়ে ও পুরুষের নাচ। গানের সঙ্গে নাচে। ঢোল ও করতাল বাজে সঙ্গে। এদের গানে ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রভাব খুব।

১৩। উড়িষ্যা :—

"পাইক্"—একদল যুবকের ঢাল-তলোয়ার হাতে নাচ। গান নেই। সঙ্গে বাজে ঢোল, নাকাড়া, মন্দিরা ও সানাই। ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলের যুদ্ধ-নৃত্য।

"ঘুমর"—বাংলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মত আদিবাসী মেয়েদের নাচ। ছেলেরাও সঙ্গে থাকে। গানের সঙ্গে বাজে মাদল, করতাল ও বাঁশী।

"ছৌ"—পুরুষদের নৃত্যনাট্য কেবল তালের বাজনার সঙ্গে। বাংলাদেশের পুরুলিয়া অঞ্চলের মুখোশ-পরা ছৌ নাচের মত সকলেই মুখোশ পরে।

১৪। পণ্ডিচেরী :—

"চিন্দু"—হরিজন সমাজের পুরুষ কাঠিনৃত্য। গানের সঙ্গে বাজে ঢোল, মন্দিরা ও একপ্রকার চামড়ার তালবাদ্য।

"শিলাম্বু"—তিনভাগে পুরুষ ও মেয়েরা নাচে। একদল পুরুষের হাতে কাঠি। দ্বিতীয় দলের হাতে পিতলের ভিতর ফাঁপা গোল চাকতি। তার ভিতরে ছোট ছোট লোহার গুলি থাকায় তালে তালে হাতের ঝাঁকুনির সঙ্গে ঝম্ ঝম্ শব্দ করে। তৃতীয় দলে নাচে মেয়েরা, সঙ্গে থাকে শঙ্খ, মন্দিরা ও ঢোলের বাজনা। এটি আধুনিক নাচ। তিনটি ভিন্ন নাচকে একত্র করা হয়েছে।

১৫। পাঞ্জাব :—

"নটী"—কুলুজেলার মেয়ে ও পুরুষের একত্র নাচ। গান গেয়ে নাচে ছেলেমেয়েরা পরপর কোমর ধরে।

"ধামিয়াল"—হরিয়ানা অঞ্চলের মেয়েপুরুষের মিলিত নৃত্য। ছেলেদের হাতে রঙিন রুমাল। গানের সঙ্গে বাজে চামড়ার তালবাদ্য।

কুলু উপত্যকার একটি পুরুষ নাচ। এক হাতে তলোয়ার, আর এক হাতে রঙিন রুমাল। উপরিউক্ত নটী নাচের বাজনা বাজে গানের সঙ্গে।

বরদিনটী—উত্তর প্রদেশ

বরদিনটী—উত্তর প্রদেশ

কুদ্—জম্মু ও কাশ্মীর

ভাঙ্গড়া—পাঞ্জাব

"ত্রিণ্‌জান"—আধুনিক নাচ। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্যে রচিত হয়েছে পাঞ্জাবের "কিক্‌লি" ও "গিড্ডা" নাচের অনুকরণে। গানের সঙ্গে ঢোলক বাজে।

১৬। রাজস্থান :—

"ঘেরঘুমের"—পুরুষ ও মেয়েদের মিলিত নাচ। গানের সঙ্গে খালি হাতে নাচে, সঙ্গে বাজে ঢোল, কাঁসি ও ছোট বাঁশী।

"গরাসিয়া" নামে আবুপাহাড়ের পুরুষ ও মেয়েদের নাচ। ছেলেদের হাতে কাঠি। মেয়েরা খালি হাতে। নাচের নাম "বলার" নৃত্য। সঙ্গে গান গায়।

১৭। ত্রিপুরী :—

ত্রিপুরা অঞ্চলের মেয়ে ও পুরুষের নাচ। নাচটি আধুনিক ও নতুন তৈরি করা নাচ বলে অনেকেরই ধারণা।

১৮। উত্তর প্রদেশ :—

"সখিয়া"—নাচে ছেলেরা ঢোল বাজায়, মেয়েরা মন্দিরা হাতে দল বেঁধে নাচে। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী এরা।

"বরদি নটী"—দেরাদুন অঞ্চলের অধিবাসী ছেলেমেয়েদের একত্র নাচ। গানের সঙ্গে। জলপূর্ণ ঝারি মাথায় বসিয়ে, একটি কাঁসার থালি হাতের এক আঙ্গুলের উপর রেখে দুটি মেয়ে নাচল। বড় ঢাক, নাকাড়া, শিঙ্গা, করতাল ও খঞ্জনি বাজে সঙ্গে।

"পাণ্ডব"—পুরুষদের নাচ। হাতে তীর, ধনুক ও গদা। দ্রৌপদীর ভূমিকায় থাকে একজন মেয়ে। ঢোল, নাকাড়া, শিঙ্গা বাজে গানের সঙ্গে।

"চৌকলকেদার" পুরুষদের নাচ। একহাতে চামর, এক-হাতে রুমাল। গানের সঙ্গে বাজে ঢোল, শিঙ্গা, নাকাড়া ও শঙ্খ।

১৯। পশ্চিম বাংলা :—

"রাইবিশে", "বাউল", "ঝুমুর" ও "সাঁওতাল" নাচ। সঠিক নাচ একবারও হয়নি। দল নির্বাচনও ভাল ভাবে হয়নি। পুরুলিয়া জেলায় নানা প্রকার উৎকৃষ্ট নাচ থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে এখনো পর্যন্ত কোন দল যায়নি।

২০। পেপ্‌সু :—

"ভাঙ্গড়া"—পুরুষ নৃত্য। গানের সঙ্গে। ঢাক ও আরো নানা প্রকারের তাল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

"গিড্ডা"—মেয়েদের নাচ।

২১। জম্মু ও কাশ্মীর :—

"কুদ্‌"—পুরুষ নৃত্য। ঢোল, করতাল, বাঁশী বাজে সঙ্গে। গান নেই।

"গদ্দি"—ঢোল ও বাঁশী সঙ্গে বাজে। হাতে তালি দেয়। মাঝে মাঝে মুখে জয়ধ্বনি করে দেবতার।

এই উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আর অন্যান্য আসরে ভারতের নানা প্রদেশের লোকনৃত্যের পরিচয় পেয়ে মনে হয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শত শত নাচের মধ্যে নৃত্যভঙ্গিমায়, ছন্দে, গানে, বাদ্যযন্ত্রে, সাজেপোশাকে যে বৈচিত্র্য ও পার্থক্য প্রকাশ পায়, তার মধ্যে কাউকে শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে বিচার করা বড় কঠিন কাজ। লক্ষ্য করেছি যে, কাথিয়াবাড়ের রাস-নৃত্যের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব প্রান্তের নাগা সম্প্রদায়ের নাচের যদি তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, এই দুই

দেশের লোকনৃত্যে বিরাট পার্থক্য। সাধারণ দর্শকের মনে হবে রাস-নৃত্য তুলনায় উৎকৃষ্ট। কিন্তু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগাদের নাচের মধ্যে যে সহজ ও সরল ছন্দময় একটি মাধুর্য রয়েছে তা উপেক্ষণীয় নয়। এ নাচের সাজে, পোশাকে ও ভঙ্গীতে এমন একটি রস প্রকাশ পায়, যা রসিক দর্শকের মনকে অবশ্যই আকৃষ্ট করবে।

বাহ্যিক সাজসজ্জায় ও নৃত্যভঙ্গীতে যতই পার্থক্য থাকুক, কতগুলি মূল ধর্মের উপর ভারতের যাবতীয় দলবদ্ধ লোকনৃত্যগুলি প্রতিষ্ঠিত। সেই ধর্মটি যদি ঠিকমত বুঝে নিতে পারা যায়, তাহলে বাহ্যিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে ভালমন্দের সঠিক বিচার করা একেবারে অসম্ভব নয়। এছাড়া অন্য পথে বিচার করতে গেলে নানারকমের সমস্যার উদ্ভব হতে বাধ্য।

দলবদ্ধ লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্যে আমি নিম্নোক্ত সাতটি মূল সূত্রের উপর সেগুলিকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি।

১। ভারতীয় লোকনৃত্যের মধ্যে বিশেষ ও বিরাট স্থান জুড়ে আছে দলবদ্ধ সামাজিক নৃত্যগুলি। এ নাচ পেশাদারী নাচ নয়। পেশাদারী নাচের উদ্দেশ্য হ'ল অন্যকে আনন্দ দেওয়া। অর্থাৎ মুজ্‌রো নিয়ে দর্শকের চিত্তবিনোদন করা। দলবদ্ধ লোকনৃত্য একথা একেবারেই ভাবে না। অন্যান্য শিল্পকলার প্রয়োজন যেমন সমাজের সামগ্রিক জীবনকে পরিপূর্ণতা দেবার জন্য, গ্রামের সামাজিক দলবদ্ধ নাচও গড়ে উঠেছে যুগে যুগে আপনা থেকে সমাজের সেই একই উদ্দেশ্যে। তাই এর নাচিয়েরা সমাজের অন্যদের আনন্দদানের চেয়েও নিজেদের আনন্দের কথাটাই সর্বাগ্রে এবং সর্বোচ্চে স্থান দেয়। অর্থাৎ নিজে এই নাচে অন্যদের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠবে, এই হল এইসব নাচের প্রধান উদ্দেশ্য এবং দলবদ্ধ সামাজিক নাচের উৎপত্তির মূল কারণও হল এই। বাইরে থেকে দর্শক হিসেবে এইসব দেখে

আমরা সবচেয়ে মুগ্ধ হই তখন, যখন দেখি সমগ্র নৃত্যদল নাচের ছন্দে ও দোলায় গভীর আনন্দে ডুবে গেছে।

২। দলবদ্ধ লোকনৃত্য হোলো আসলে একতার বা ঐক্যের নাচ। এক ছন্দে, এক সঙ্গে, এক ভঙ্গীতে অনেকের মিলনের নাচ। নাচের সময় সকলের মন ঐক্যবোধের এমন একটি আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বাইরে থেকে দর্শক তখনি সেই আনন্দের সন্ধান পাবে, যখন সে নাচিয়েদের মত ছন্দরসের গভীরে প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু দর্শক হিসেবে তা অনুভব করা খুবই কঠিন। অত্যন্ত অনুভূতিশীল রসিক-মন ছাড়া তা সম্ভব নয়।

দলবদ্ধ নাচের নাচিয়েরা গ্রামের নানা বয়সের, নানাপ্রকার ভিন্নমুখী মনোবৃত্তির নরনারী। কিন্তু নাচের সময় মনের ও দেহের সেই ভিন্নতা দূর হয়ে যায়। নিজেদের ভিতরকার ভেদাভেদের চিন্তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। সবাই তখন হয়ে ওঠে এক প্রাণ, এক মন। একতার এই আবহাওয়াটিই হল দলবদ্ধ নাচের একটি অমূল্য সম্পদ। এই সময় যদি দেখা যায়, একজন নাচিয়ে দলের মধ্যে নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে, যার দ্বারা নাচের ঐ একতার আদর্শটি খর্ব হচ্ছে, তখন বলতেই হবে যে, সে উৎকৃষ্ট নাচিয়ে হলেও দলের অনুপযুক্ত। যদি দেখা যায় তার নাচের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা উদ্দেশ্যটি সার্থক হতে চলেছে, তখন তা মার্জনীয়। সুতরাং দলবদ্ধ লোকনৃত্যে একতার উদ্দেশ্যটিকে লক্ষ্য রেখেই আঙ্গিকের উৎকর্ষতার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

৩। ছন্দের গতি এ নাচের একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক। নাচ আরম্ভ যে লয়েই হোক না কেন, ক্রমশ সেই ছন্দের গতি বাড়বে। কিন্তু গতির এই পরিবর্তন এমন সহজ ও অনায়াসে ঘটে যে, নাচের সময় নাচিয়েরা কেউ তা অনুভব করে না। বাইরের থেকে দেখে কিছুটা বোঝা যায়। দ্রুত ছন্দের গতির সময় নাচিয়েদের যথেষ্ট

শারীরিক পরিশ্রম হয়। কিন্তু সে পরিশ্রমের কথা তখন তাদের মনেই থাকে না। তখন দেহ-মনে জাগে নাচের ছন্দে একটি প্রবল উন্মাদনা। সেই উন্মাদনাই এনে দেয় এক অলৌকিক শক্তি, যা সাধারণ অবস্থায় কেউ ভাবতেই পারে না। লোকনৃত্যের এই গতির পরিবর্তন যখনই নাচিয়েরা বারে বারে অনুভব করেছে, তখনই ধরে নিতে হবে সে নাচে কোথাও ত্রুটি ঘটেছে। এক-একটি নাচে কয়েকটি মাত্র ভঙ্গী ও পদচালনায় পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। ইদানীং দিল্লীর লোকনৃত্য উৎসবে লক্ষ্য করেছি নূতনত্ব দেখাবার উৎসাহে ভঙ্গী ও পদচালনায় বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা। কিন্তু দেখেছি, সে চেষ্টা সমগ্রভাবে নাচের সহজ গতির বাধা সৃষ্টি করছে। যতক্ষণ না সে নূতনত্ব মূল নাচের গতির সঙ্গে সহজভাবে মিশে যেতে পারছে, ততক্ষণ সে ভঙ্গী ভাল হলেও তা দোষের বলে গণ্য হবে।

৪। ভারতবর্ষের লোকনৃত্যের বৃহৎ অংশ অনুষ্ঠিত হয় গান ও তালবাদ্যের সম্মিলনে। আবার শুধু তালবাদ্যের সঙ্গে বাঁশি, সানাই, শিঙ্গা জাতীয় নানা যন্ত্রের সমবায়েও নাচতে দেখেছি। এমনও নাচ দেখেছি যেখানে গান বা তালবাদ্য বলতে কিছুই নেই। কেবল মুখে ছন্দবহুল কতগুলি শব্দের সাহায্যে নাচছে।

গানের সঙ্গে যেখানে দলবদ্ধ নাচ চলে, সেখানে সে-গানের সুরে আছে সাধারণ লোকগীতির করুণ মাধুর্য। গানের ছন্দও নৃত্যের ছন্দের অনুকূল; অর্থাৎ নাচের ছন্দের সঙ্গে সমানভাবে গানের ছন্দ বাড়তে থাকে। বাঁশি ও সানাইয়ের সুরের সঙ্গে নাচের বেলায়ও একই নিয়ম। অত্যন্ত ঢিমা লয়ের গানের সঙ্গে দলবদ্ধ লোকনৃত্য এখনো পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। সাধারণত দলবদ্ধ এই সব নাচের মধ্যে আলাদা করে গানের দল থাকে না। গান গায় সমবেত কণ্ঠে নাচিয়েরা নাচতে নাচতে বাজনার তালে তাল মিলিয়ে।

গানের ভাবের সঙ্গে দলবদ্ধ লোকনৃত্যের কোন সম্বন্ধ থাকে না।

অর্থাৎ গানের কথায় যে অর্থই প্রকাশ পাক না কেন, নাচিয়েরা নাচের ভিতর দিয়ে কথাকলি, ভরতনাট্যম বা কথকের মত ভাবের অভিনয় দ্বারা তার অর্থ প্রকাশের চেষ্টা করে না। একমাত্র লক্ষ্য থাকে গানে ও বাজনার ছন্দের সঙ্গে নিজেদের দেহভঙ্গীর ছন্দকে মিলিয়ে নেবার। এই সব গানের কলির পর কলিতে কথা বদলে যাচ্ছে, কিন্তু সুরের বদল হয় না। নাচেও ঠিক তাই। ভঙ্গীর পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই এই সব নাচে, গানের সুরের মত।

৫। নাচিয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদও বিশেষ একটা আদর্শ ধরে রচিত।

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশবাসীর প্রাত্যহিক জীবনের পরিচ্ছদে আমরা লক্ষ্য করি সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার প্রভাব ও সেই অঞ্চলে যা সহজে উৎপন্ন হয় বা পাওয়া যায় তা দিয়েই সেগুলি তৈরি। এই কারণেই ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পরিচ্ছদের এত পার্থক্য। নাচের সময় সেই পরিচ্ছদেরই একটি শোভন ও সুন্দর সংস্করণ নাচিয়েদের দেহে আমরা দেখতে পাই। এগুলি তারা নিজেরাই তৈরি করে নেয় তাদের সামর্থ্য মত উৎসব দিনের পোশাক হিসেবে। গায়ের জামা, পরনের কাপড় বা শাড়ি, উড়নি বা চাদর, মাথার পাগড়ি, ঘাগরা, জ্যাকেট ও নানাপ্রকার গয়না সবই বিচিত্র রঙ্গে ও নকশায় নতুন রূপ গ্রহণ করে। প্রতিদিনের কর্মজীবনে তারা যে পরিচ্ছদ বা গয়না ব্যবহার করে, নাচের দিনে তা পরে না।

গ্রামবাসীদের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ব্যবহারের মধ্যে আমরা পাই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব একটি প্রাচীন সুন্দর রীতির পরিচয়। এখনো পর্যন্ত এরা তা ধরে রাখতে পেরেছে। এই সব সাজসজ্জার পিছনে বহুকালের ভারতীয় শিল্পীমনের একটি পরিষ্কার ছাপ প্রকাশ পায়। রঙের, গয়নার ও পরিচ্ছদের পরিমিত ও ছন্দময়

ব্যবহারের যে পরিচয় তারা রেখে গেছে তা এযুগের শিক্ষিত শহরবাসী শিল্পীদেরও শিক্ষার বিষয়।

সাজ-পোশাকের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, নাচের ও নাচিয়ের দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তা তৈরি। সাজের অপরিমিত ব্যবহারের দ্বারা দেহকে এমন কোন ভাবে ভারাক্রান্ত করতে দেখা যায় না, যাতে করে নাচের স্বাভাবিক গতির বাধা হতে পারে। গতির সঙ্গে তা সহজেই খাপ খেয়েছে। কিন্তু ইদানীং শহরের শিক্ষিত শিল্পীদের প্রভাবে কোন কোন অঞ্চলের গ্রামবাসীরা নিজেদের এতদিনকার এই আদর্শ ত্যাগ করে, নতুনত্ব আনবার উৎসাহে নানা অনাবশ্যক রঙের কাপড়ে ও গয়নার ব্যবহারে নিজেদের এমনভাবে সাজায় যে, তার দ্বারা বেশ বোঝা যায়, তারা তাদের শিল্পরুচিকে অবনতির পথেই এগিয়ে দিচ্ছে। একথা তারাও যেমন বুঝতে পারছে না, শিক্ষিত শহরবাসী শিল্পীরাও নয়।

৬। দলবদ্ধ লোকনৃত্যের গতি হল প্রধানত বৃত্তাকারের। তারপরে দেখা যায় সামনে এগিয়ে বা পিছিয়ে। আবার কখনো কখনো অনেকের সঙ্গে এক জায়গায় জটলা করেও নাচে। কিন্তু এই তৃতীয় পদ্ধতির নাচ সংখ্যায় খুবই কম। ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে 'কোরিয়োগ্রাফী' তার বৈচিত্র্য কোন একটি নাচের পদচালনায় বা ভঙ্গীতে দেখা যায় না। অর্থাৎ যে নাচের গতি বৃত্তাকারে তাতে দুই সারিতে সামনে এগিয়ে পিছিয়ে বা সারি ভেঙে এলোমেলো নাচ কখনো দেখিনি। প্রত্যেকটির জন্যেই আছে আলাদা গানের বা বাজনার সঙ্গে আলাদা নাচ। লোকনৃত্য উৎসবে ইদানীং দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষিত সরকারী কর্মচারীরা একই নাচে 'কোরিয়োগ্রাফী'র বৈচিত্র্য দেখাবার জন্যে গ্রামবাসীদের শিখিয়ে পড়িয়ে আনছে। তাতে করে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নাচে প্রকাশ পেয়েছে উন্মাদনার অভাব ও জড়তা। ছন্দের দোলা বারে বারেই ব্যাহত হয়েছে। এটিও একটি বড় রকমের ত্রুটি।

৭। দলবদ্ধ লোকনৃত্যে বাজনার যে দল থাকে, তাদেরও একটি বিশেষ স্থান ও প্রয়োজন আছে নাচের উৎকর্ষতায়। এই দল সর্বদাই নাচের দলের এক আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে দলের মাঝখানে, সামনে, পাশে বা চারিদিকে ঘিরে থাকে। এদের অঙ্গভঙ্গী, চালচলন নাচিয়েদের সঙ্গে হুবহু এক নিয়মে গঠিত নয়। কিন্তু তারাও অধিকাংশ সময়ে চেষ্টা করে মূল দলের সঙ্গে ছন্দে সমতা রেখে চলতে। এদের সঙ্গ ছাড়া সমগ্র নাচটি অসম্পূর্ণ বলেই মনে হবে। লোকনৃত্য উৎসবে কতগুলি নাচে দেখেছি বাজনার দলকে শহরের রঙ্গমঞ্চের নাচের সঙ্গত-দলের মত আলাদা একস্থানে বসিয়ে বা দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা লোকনৃত্যের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। বাজনার দল ও নাচের দল এক হয়ে একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে বলেই পরস্পর পরস্পরকে মাতিয়ে তুলতে পারে। দলবদ্ধ নাচের সঙ্গে বাজনার দলের সম্মিলনেই দলবদ্ধ লোকনৃত্য পায় সত্যিকারের পূর্ণতা।

ভারতীয় লোকনৃত্য—কথক, মনিপুরী, কথাকলি, ভরতনাট্যম জাতীয় নানারূপ উচ্চাঙ্গের নৃত্যাভিনয়ও তার অন্তর্গত—দেখলে বোঝা যায় প্রাচীন ভারতের গ্রামসমাজে লোকনৃত্যকে কত ব্যাপক ও উচ্চাঙ্গের করে তুলতে পেরেছিল। এ যুগের নগরবাসীরা নৃত্যকে আজও এমন ব্যাপকভাবে সমাজে স্থান দিতে পারেনি।

গ্রামসমাজের মত সহজ ছন্দ ও ভঙ্গীর দলবদ্ধ সামাজিক নাচ ভারতের কোন নগরে আজও গড়ে উঠল না। এমন কি নিজেদের আমরা এতখানি বড় করে দেখছি যে, গ্রামের সেই দলবদ্ধ সহজ নাচকে আজ পর্যন্ত কোথাও সামাজিকভাবে নগরবাসী আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না। তাকে এতদিন অস্পৃশ্যের মত অবজ্ঞা করা হয়েছে, আজও হচ্ছে। হালে এই অবজ্ঞার মনোভাব খানিকটা দূর হলেও এতদিনকার স্বভাব বদলাবার লজ্জাকে কাটিয়ে উঠতে এখনো

পারিনি। গত চল্লিশ বছর যাবৎ নগরবাসীদের মধ্যে নাচের যে আন্দোলন জেগেছে, তার সঙ্গেও এতদিনকার প্রচলিত গ্রামসমাজের আদর্শের যে একটুও মিল নেই তা আগেই বলেছি। গ্রামবাসীর মত কেবলমাত্র আনন্দের খোরাক হিসেবে দলবদ্ধ নৃত্যের আন্দোলন আজও নগরসমাজে জাগেনি। হয় নগরকেন্দ্রিক সমাজে প্রচলিত নৃত্যকে ভারতীয় গ্রামসমাজের আদর্শে রূপান্তরিত করতে হবে, নয় নাগরিক সমাজের নৃত্যের আদর্শের মোহ ত্যাগ করে গ্রামসমাজকেই আবার আগের মত নিজের চিরন্তন আদর্শকে ভিত্তি করে নৃত্যের ক্ষেত্রে উঠে দাঁড়াতে হবে। এইভাবে ভারতীয় লোকনৃত্যের প্রাচীন, ব্যাপক ও পূর্ণ রূপকে আবার প্রকাশ করে নতুন ভারতের নতুন জীবন নতুন করে শুরু হোক, এই যেন হয় লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে সকল ভারতবাসীর আজকের দিনের একমাত্র কামনা।

বাংলার গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় "খেম্‌টাওয়ালী" বা "ঝুমুরী" নামে আর এক শ্রেণীর নর্তকী। তারা করতো উৎসব অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীদের চিত্তবিনোদন। এখনো এই শ্রেণীর নর্তকীদের বাংলাদেশে নানা-স্থানে দেখা যায়। আসলে এরা হলো বড় বড় শহরের বাইজীদেরই গ্রামীণ সংস্করণ। এদের গানের ভাষা বাংলা। নানাপ্রকার রাগ ও রাগিণী যুক্ত প্রেমের গানই এরা গায়। আগেকার দিনের 'খেম্‌টা' নামের একটি বিশেষ তালেই গানগুলি হয় বলে এই নাচ 'খেম্‌টা' নামেই পরিচিত।

'ঘেটু গান' বা 'ঘেটু নাচ' নামে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের পেশাদারী নাচ আছে। এটি একটি সুদর্শন ও সুকণ্ঠ বালকের গানের সঙ্গে নাচ। কিন্তু তাকে সুন্দরী যুবতীর সাজে সাজতে হয়। নাচটি সম্পূর্ণরূপে পেশাদারী। বাইজী বা খেম্‌টাওয়ালীদের নাচের আদর্শেই এ নাচ গঠিত। শোনা যায় ইদানীং এ নাচের প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে খুবই কমে এসেছে। কিন্তু বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে এমন ছিল না।

বাংলার গ্রামাঞ্চলে আর এক রকমের নাচ বহু যুগ ধরেই চলে আসছে। সেগুলি কিন্তু উপরোক্ত ধরনের পেশাদারী নাচ নয়। সে সবই হলো গ্রামসমাজের সকলের নাচ। একেই আজকাল আমরা Folk Dance বলছি। এই নাচের অধিকাংশই হচ্ছে দলবদ্ধ নাচ তা সে পুরুষেরই হোক বা নারীদের জন্যেই হোক। গ্রামসমাজের নানাপ্রকার উৎসব অনুষ্ঠানকে ঘিরে এই নাচগুলির উৎপত্তি।

বাংলাদেশের বর্ষশেষের উৎসব হলো চড়কপূজার উৎসব। ঐ

দিনে বাংলার নানা অঞ্চলে দশাবতার নৃত্য, ধূপনৃত্য, ফুলসন্ন্যাস, শ্লোক, চালন এবং বায়েল নামে কতকগুলি নাচ এক যুগে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এ নাচগুলির প্রায় সবই পুরুষের দ্বারা সম্পন্ন হতো। আজকাল দশাবতার নৃত্য বাংলায় আর বড় দেখা যায় না, কিন্তু বড় ধূপদানী হাতে ধূপনৃত্যের নমুনা দেখা যায় পুরুষদের মধ্যে দুর্গাপূজার উৎসবে। শ্লোকনৃত্য হতো কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নানাপ্রকার কবিতা ছড়ার মত করে সহজ সুর ও ছন্দের গানের সঙ্গে। এসব নাচ কথাকলি বা ভরত-নাট্যমের মত মুদ্রাভিনয়ের নাচ নয়। আঙ্গিকের দিক থেকে এ নাচ খুব উঁচুদরেরও ছিল না। অধিকাংশ নাচের সঙ্গে বাজতো বড় ঢাক ও কাঁসির তাল। লাঠি হাতে বা রুমাল হাতে দলবদ্ধ নাচ পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের বীরভূম জেলার 'রাইবিশে' হল প্রাচীন যোদ্ধাজাতির একপ্রকার পুরুষনৃত্য। আজও তার কিছু কিছু বেঁচে আছে। খালি হাতে, ঢাল তলোয়ার হাতেও এদের নাচতে দেখা যেতো। এই নাচের সঙ্গত হলো কেবল-মাত্র ঢাক ও কাঁসির তাল। মহরমের উৎসবে মুসলমানদের মধ্যে লাঠি ঢাল তলোয়ার ইত্যাদি নানাপ্রকার অস্ত্র হাতে নাচের সঙ্গে সকলেই পরিচিত। বাংলাদেশের পুরুষদের, বড় বড় ঢাক নিয়ে একসঙ্গে ধর্মপূজার উৎসবের রাত্রিতে একতালে ও এক ভঙ্গীতে নাচতে দেখেছি।

এক সময়ে বাংলাদেশের গ্রামে মেয়েদের মধ্যে নানাপ্রকার ব্রত, পূজা, অনুষ্ঠান ও বিবাহাদি উৎসবে নাচের বিশেষ প্রচলন ছিল। বর্ষার প্রথম দিনে মেয়েরা গান গেয়ে আঁচল ধরে ঘুরে ঘুরে নাচতো। মাঘ মাসে কুমারী মেয়েরা মাঘমণ্ডল ব্রতের সময় খুব ভোরে ফুল গাছের চারদিকে ফুল ছড়িয়ে ব্রতগান গেয়ে নাচতো। গ্রামের বিবাহ অনুষ্ঠানে বয়স্ক ও কুমারী মেয়েরা নিজেদের মধ্যে গান ও নাচে মেতে উঠতো। 'গঙ্গা পূজা' নামে বিয়ের একটি অনুষ্ঠানে মেয়েরা গান গেয়ে

গঙ্গাবরণ নৃত্য করতো। পাত্র-পাত্রীকে বিয়ের অনুষ্ঠানে স্নান করানোর সময় ধুনচি নিয়ে গান গেয়েও নাচতো। এই ভাবে অনেকগুলি স্ত্রী-আচারে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে গান ও নাচের চলন ছিল।

মেয়েদের এই সব নাচ মুদ্রাভিনয়ের মত জটিল আঙ্গিকের নাচ নয়। এ হলো গানের ছন্দে, ঢোল ও কাঁসির তালে তাল মিলিয়ে সহজ অঙ্গবিক্ষেপ ও পদ-চালনার নাচ। গ্রামের মেয়েদের এই ধরনের নাচের মধ্যে শহরের বাইজী বা গ্রামের খেম্‌টাওয়ালীদের নাচের প্রভাব দেখা যায় না, বিশেষ করে দলবদ্ধ সামাজিক নাচে। যেমন কোমর দোলানো নাচ। কিন্তু গ্রামের যে-সব নাচে ছেলেরা মেয়ে সেজে নাচে তা পেশাদারী দলের নাচ না হলেও কোমর দোলানো আঙ্গিকের প্রাধান্য তাতে অত্যন্ত বেশী; কতকটা খেম্‌টাওয়ালীদের মত। সে নাচের প্রভাবেই এরা নাচে।

এ ছাড়া পুরুলিয়া জেলার গ্রামে গ্রামে পুরুষ ও মেয়েদের যত রকমের উৎকৃষ্ট লোকনৃত্য দেখেছি, তার পরিচয় দেশবাসীর ভাল করে জানা নেই। এর প্রচারে লোকনৃত্য জগতে বাংলার গৌরব যে খুবই বেড়ে যাবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

ভাদ্রমাসে, পশ্চিম বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গ্রামবাসী পুরুষেরা 'ভাদু' 'তুসু' নামে কোন এক প্রাচীন রাজকুমারীর কথা স্মরণ করে নিজেরা গান রচনা করে ও রাস্তায় রাস্তায় ঢোল ও করতালের তালে তা গেয়ে বেড়ায়। এই সঙ্গে থাকে মেয়ের সাজে একটি বালক। কোমর দুলিয়ে সে ঢোল ও করতালের তালে তালে পা ফেলে গানের সঙ্গে নাচে। কিন্তু এ নাচ অভিনয়নৃত্য নয়। পায়ের ছন্দের দিকে থাকে সব ঝোঁক।

পশ্চিম বাংলায় একরকমের পুতুলনাচ দেখতে পাই। এই পুতুলগুলি আকারে দু'ফুট থেকে আড়াই ফুটের মত উঁচু। এগুলি লম্বা

বাঁশের লাঠির ডগায় বাঁধা থাকে। পুতুলের হাত, মুখ, পায়ের সঙ্গে থাকে কালো সুতো বাঁধা। এক মানুষ উঁচু একটি পরদার আড়ালে দর্শকদের উল্টোদিক থেকে পুতুলগুলি নাচানো হয়। যারা পরদার আড়ালে থেকে তাদের নাচায় দর্শকরা তাদের দেখতে পায় না। প্রত্যেক পুতুলের জন্যে স্বতন্ত্র একজন মানুষ থাকে। পুতুলের ডাণ্ডাটির অপরদিক এদের কোমরের সঙ্গে বুকের দিকে বাঁধা থাকে। প্রত্যেক পুতুল তৈরি হয় রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে। কারণ পুতুলনাচের বিষয়বস্তু ঐ কটি প্রাচীন সাহিত্য থেকে গৃহীত হয়। ঢোল, সানাই ও কাঁসার করতালের ছন্দে হয় অভিনয়-নৃত্য। কখন কখন পাত্র-পাত্রী অনুযায়ী কথাও বলে নিচের মানুষেরা। তারাই নিচ থেকে কথা বা বাজনার তালে তালে সুতো টেনে পুতুলের অঙ্গভঙ্গী ভাবানুযায়ী পরিচালনা করে। সামনে থেকে দেখে মনে হবে পুতুলগুলি যেন মানুষের মতনই অঙ্গভঙ্গী করে অভিনয় ও নাচ করবার চেষ্টা করছে। নাচের সময় বা অভিনয়ের সময় জায়গার বদল করতে হয়, চলতে ফিরতে হয়। এ সবই নিচের মানুষের দ্বারাই করা হয়। তারাই চলে ফেরে ও জায়গা বদল করে। এরূপ একটি প্রাচীন ধারাও বাংলাদেশে আজ অল্পই দেখা যায়।

পুরুলিয়ার বাংলাভাষী অঞ্চলে আজও 'ছৌ' নাচ পুরুষদের মধ্যে খুবই প্রচলিত। এ এক ধরনের পরিপূর্ণ নৃত্যাভিনয়। কিন্তু তাই বলে মুদ্রাভিনয় নয়। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্পগুলিই এই নৃত্যাভিনয়ের প্রধান বিষয়। ঢাকের তালে ও সানাইয়ের সুরে এ নাচ সম্পন্ন হয়। নৃত্যাভিনেতারা নাটকের পাত্র-পাত্রীদের মত যেখানে যার প্রবেশ ও প্রস্থান দরকার তা করছে, কিন্তু সবই নাচের ছন্দে ও নৃত্যভঙ্গীতে। আজকাল সাজপোশাকে আগের যুগের থিয়েটার বা যাত্রার প্রভাব রয়েছে পূর্ণভাবে। গান থাকে না। অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ভাব ব্যক্ত করে মাত্র। নাচের ভঙ্গী খুবই পৌরুষ-

ব্যঞ্জক। স্ত্রী চরিত্রগুলি ছেলেদের দ্বারাই অভিনীত হয়। অভিনয়ের গোড়াতে একজন সূত্রধার গণেশের বন্দনাগান করার পর গানের সুরে ও ছন্দে অভিনয়ের গল্পটি বলে যায়, তার পরে শুরু হয় নাচ। এটিও একটি পরিপূর্ণ মুখোস নৃত্য।

বাংলাদেশের বৃহৎ সংখ্যার আদিবাসী সমাজের মধ্যে নাচ প্রচুর। বিশেষ করে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মেয়েদের নাচ। নাচ তাদের সমাজের যাবতীয় উৎসব অনুষ্ঠানের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এদের গান, তাল ও নাচের ভঙ্গীর সঙ্গে বাংলার অন্যান্য গ্রামসমাজের নাচের সঙ্গে মিল খুবই কম। এ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের নাচ। পেশাদারী একক নাচ নেই। দলবদ্ধ নাচই এরা করে। গানের সঙ্গে বেশীর ভাগ নাচে মেয়েরা। সঙ্গে তাদের সঙ্গত হল মাদল, নাকাড়া, বড় কাঁসার করতাল ও বাঁশের বাঁশি। পুরুষদের নাচে গানের চেয়ে বাদ্যযন্ত্রই অধিক ব্যবহৃত হয়।

উপরোক্ত সব নাচই উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের নাচ।

ইংরেজ অধিকারের যুগে কলকাতার মত বড় বড় শহরকে ঘিরে নতুন যে এক শিক্ষিত সমাজের সৃষ্টি হলো, সে সমাজ গ্রামের কোন-রকমের অপেশাদারি নাচকে গ্রহণ করলো না। এদিকে শহরের ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় পেশাদারী নর্তকীদের নিয়ে একটি পঙ্কিল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল বলে তাকেও নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে পারল না। এরদ্বারা শহরের শিক্ষিতদের মধ্যে নাচ জিনিসটাই হয়ে দাঁড়ালো ঘৃণার বস্তুবিশেষ; এবং একে রুচিহীন নিম্নস্তরের কলা হিসেবেই দেখা হতো। মানুষের সমাজে এর যে কোন প্রয়োজন থাকতে পারে সে কথাও এরা ভুলে ছিল। গ্রামাঞ্চলে সামাজিক নাচের প্রচার কমে আসার একটি বড় কারণ হলো শহরবাসী শিক্ষিত সমাজের নাচের প্রতি বিরূপ মনোভাব।

এ যুগের শহরবাসী শিক্ষিতদের মধ্যে গ্রামীণ নৃত্যকলার প্রতি

প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে, তাঁর শান্তিনিকেতনের বিত্তালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা। ১৯২৯ সালে উদয়শঙ্করের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ-নৃত্যের কতকগুলি ঢং নতুনরূপে শিক্ষিতদের মনোহরণ করে। অনেকে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐ প্রকার গ্রামীণ নাচের চর্চায় মনোযোগী হয়।

১৯৩১ সালে বাংলার শিক্ষিতদের মধ্যে আর একটি নৃত্য আন্দোলনের সূত্রপাত হল গুরুসদয় দত্তের দ্বারা। তিনি ছিলেন সে যুগের একজন আই. সি. এস. ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর নৃত্য আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মৃতপ্রায় নৃত্যগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা, যুগোপযোগী করে শিক্ষিতদের মধ্যে তার প্রচার করা। এঁরই উৎসাহে বীরভূমের রাইবিশে, ঢালিনৃত্য, ময়মনসিংহের মুসলমান সমাজের 'জারি' নৃত্য ও কয়েকপ্রকার ব্রতনৃত্য শিক্ষিত সমাজে বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠে। ইনি বাংলার বিত্তালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই নাচের প্রচারের বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষক তৈরির বিত্তালয়ও স্থাপিত হয় তাঁর চেষ্টায়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে আন্দোলনের প্রসার ধীরে ধীরে কমে আসে। সামান্য কয়েকটি কেন্দ্রে এখনো তার কিছু চর্চা হয়।

শহরবাসী শিক্ষিতসমাজে গ্রামীণ দলবদ্ধ সামাজিক নৃত্যের আদর্শে নাচের প্রচলন হোক—গুরুদেব ও গুরুসদয় দত্ত উভয়েই বিশেষভাবে চেয়েছিলেন। এই আন্দোলনের সূত্রপাত চল্লিশ বৎসর পূর্বে শুরু হলেও এ সমাজে তেমন ব্যাপকভাবে এখনো তা প্রসার লাভ করেনি। একমাত্র বৃক্ষরোপণ উৎসব ও দোল উৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে ও বনমহোৎসবের সময় বাংলার দু'এক জায়গায় তা দেখা যায়।

বাংলার বাউলদের নাচ

বাংলার বাউলরা একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়। সাম্প্রদায়িক ধর্ম এরা পালন করে না। এদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নেই। বিধি-নিয়ম আচার অনুষ্ঠান এরা মানে না। শাস্ত্রের অনুশাসন দ্বারা এরা নিয়ন্ত্রিত নয়। কৃচ্ছ্র সাধনেও এরা অসম্মত। এই জন্যে বাউলদের সাধনার এক নাম "সহজিয়া" সাধনা। এদের বলে রসিক, কেননা এরা রসোপলব্ধির সাধনা করে, এরা আনন্দ রসের অনুরাগী। এরা প্রেমের সাধনা করে। যে প্রেমের উদ্দেশ্য কেবল ভালবেসে যাওয়া। এদের ভালবাসা অধরার প্রতি। কিন্তু এই অধরাকে তারা ধরতে চায় রূপের জগতের সাহায্যে। তাই তারা বলে অধরাকে ধরতে হলে ধরার সঙ্গ করা চাই। ধরার জগৎ, রূপের জগতের আনন্দকে আগে বুঝতে চেষ্টা কর, তবেই অধরাকে ধরতে পারবে, তখনই অধরার প্রতি তোমার ভালবাসা সার্থক হয়ে উঠবে। এই অধরাই হলো এদের আর এক ভাষায় "মনের মানুষ"। এই মনের মানুষের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, পূজার ভাব একেবারে নেই। বন্ধু, সখার ভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে না—যদিও কাছাকাছি যায়। বিরহকাতর প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের সঙ্গে হয়তো এদের প্রেমের তত্ত্ব মেলে, কিন্তু মিলনের কোন কথা কোথাও নেই। মিলন হলে কি হবে, কি করবে, সে কথা ভাববার তাদের অবসরই মেলেনি। এতখানি প্রেমপাগল এই সম্প্রদায়। এরা বলছে এই মনের মানুষ অধরার স্থান হচ্ছে এই দেহে—এর মধ্যেই তিনি আছেন, আমরা মূর্খের মত ভ্রমে পড়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। অর্থাৎ নানাপ্রকার আচার বিচার প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাকে আয়ত্ত করতে চাচ্ছি বাইরের জিনিস ভেবে।

অথচ আমার মধ্যেই সেই অধরা, সেই প্রাণের মানুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইভাবে তাকে অনুভূতির সাহায্যে জানাই হোলো এদের মূলকথা।

এ সাধনা গুরুপরম্পরা সাধনা, তাই এরা মনে করে এদের এই সাধনার পথে অগ্রসর হতে হলে গুরুই হোলো প্রধান অবলম্বন। তিনি ছাড়া এই পথে অগ্রসর হবার পথ আর কেউ বলতে পারে না। তাই এরা গুরুকে এদের সাধনায় বিশেষ স্থান দিয়েছে। কখনো কখনো এমনও বলেছে যে, অধরাকে ধরতে গেলে যে 'ধরা'-র সঙ্গ করতে হবে সে 'ধরা'ই হোলেন গুরু। আর এই গুরুর শ্রীচরণ পূজাতেই অধরার সন্ধান পাওয়া যায়। এই রকম গুরুবাদের বড় কারণ হোলো লেখাপড়া-না-জানা বাউলদের কাছে গুরুরাই প্রকৃত-পক্ষে শাস্ত্রগ্রন্থ। পণ্ডিত জ্ঞানীরা পুস্তক পাঠে নিজেদের মনের ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারেন, কিন্তু অশিক্ষিতদের পক্ষে এরকম কোন সুবিধাই নেই। এরা লেখাপড়া-জানা সম্প্রদায় নয় বলেই গুরুরাও কোনদিনই কিছু লিখে রাখতে পারেনি। তাদের জ্ঞানের কথাকে, গূঢ় তত্ত্বকথাকে, কেবল গানের ভাষায় মুখে মুখে বলে গেছে। তাই বলেছি গুরুরা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে লিখিত ধর্ম-পুস্তকের সমান। যে কারণে হিন্দুদের বেদ, খৃস্টানদের বাইবেল, মুসলমানদের কোরাণ ও শিখদের গ্রন্থসাহেব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ঈশ্বর সমতুল্য পূজ্য গ্রন্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকাল আমরা সাধারণত কিভাবে তাদের দেখি। মুখে দাড়ি গোঁফ লম্বা চুল, তালুতে উঁচু করে চুড়ো বাঁধা। গায়ে সাধারণত হাতকাটা লম্বা জোব্বা, হাঁটুর একটু নিচ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। ভিক্ষাজীবী। সাধারণ লোকে গান শুনে যা দেয়, তাতেই খুশী। যাঁরা আখড়াধিপতি গুরুস্থানীয় তাঁরা তাঁদের আখড়া থেকে বড় একটা নড়েন না। আবার পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা বাউলদের এমন অনেকেই

ছিলেন যাঁরা দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতেন। রবীন্দ্রনাথের গগন হরকরা ছিলেন পিয়ন, লালন ফকিরের ছিল পানের বরোজ, তাঁর গুরু ছিলেন পাল্কীবাহক। বাউলরা সঙ্গে স্ত্রীপুত্র নিয়ে বসবাস করেছেন, সংসারও করেছেন, অথচ এঁরা যেন হাঁসের মত। জলের মধ্যে ডুব দিলেও জলে এঁদের গা ভেজে না, এঁরা ঘর যেমন বাঁধেন আবার যে-কোন মুহূর্তে ঘর ভাঙ্গতেও সেই রকম দক্ষ। একেবারে আত্মভোলা সম্প্রদায় এঁরা।

পণ্ডিতদের মতে এই ধরনের সাধনার ধারা নাকি ভারতের অতি প্রাচীন প্রথা। বৈদিক যুগেও নাকি এরকম এক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল, তারাও আচার বিচার মানত না, আপন ইচ্ছায় চলত। তার পরে নাথ যোগীরাও নাকি ছিল এই ধরনের একটি আত্মভোলা ও ত্যাগী সম্প্রদায়। বৌদ্ধগান ও দোহার সঙ্গে নাকি ভাবের দিক থেকে বাউলদের গানের সঙ্গে বহু সাদৃশ্য আছে। এই যুগে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার সঙ্গে বাউলদের সহজিয়া সাধনার মিল অনেকে দেখেছেন। এছাড়া সবচেয়ে বড় চিন্তা হোলো এই যে, মুসলমান যুগের সুফীরা এদের চিন্তাধারা ও জীবনপ্রণালীকে বিশেষভাবে চালিত করেছে। তান্ত্রিক যুগের বৌদ্ধরা মুসলমান সভ্যতার চাপে যদিও মুসলমান হোলো, কিন্তু তারা তান্ত্রিক বৌদ্ধদের বহু প্রকার বিন্যাসকে ছাড়তে পারেনি। সেই সাধনার বহুপ্রকার গুপ্ত প্রক্রিয়াকে নিজেদের এই সাধনার অঙ্গ করে নিয়েছে। পণ্ডিতরা আরো বিশ্বাস করেন যে, পারস্য দেশের সুফীদের মধ্যে সেই অঞ্চলের প্রাচীন বৌদ্ধ মতবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তা না হলে গুরুবাদে বিশ্বাস করা ও ইসলামের নীতি-বিরোধী নাচ গানকে সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। যাই হোক ভারতে এই ভাবে সুফী ও বৌদ্ধভাবাপন্ন হিন্দু সাধনার সংমিশ্রণে আমরা বাউল নামে এই বিশেষ সম্প্রদায়কে পেয়েছি।

বাউল নাচ

বাউল নাচ

বাউল নাচ

বাউল নাচে– গোপাল খেপা

বাউল নাচে—নবনী গোপাল

সব ধর্মমতই যখন মূল আদর্শচ্যুত হয়, তখন তা থেকে নানা প্রকার মতবাদ ও দলের সৃষ্টি হয়। এই বাউলদের মধ্যেও তাই ঘটেছিল। তারই ফলে আউল, নেড়ানেড়ীর দল, কর্তাভজার দল, বৈষ্ণব বাউল বা ফকির ইত্যাদির আবির্ভাব। এই সব দলগত প্রভাব বাউল গানে যথেষ্ট পড়েছে। যার বড় উদাহরণ পশ্চিম বাংলায় পেয়েছি, বাউলদের রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গানে, গৌর-নিতাই বিষয়ক ভক্তির গানে।

এদের প্রচলিত গুপ্তসাধন প্রণালী আমি দেখিনি ও জানি না। কিন্তু এরা যখন গানের ভাষায় নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে জমায়েত হয়, তখনকার সেই আবহাওয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি। দল বেঁধে বসে গেছে গোল হয়ে,—মাঝখানে একটু প্রশস্ত জায়গা। প্রায় প্রত্যেকের হাতে একতারা, কিন্তু সে একতারা পশ্চিম ভারতের ভজনপন্থী গায়কদের একতারা নয়, পশ্চিম ভারতের একতারাকে বলা চলে তানপুরার ছোট সংস্করণ। তানপুরার চার তারের বদলে এতে থাকে এক তার কিংবা দুই তার। বাংলার বাউলদের মধ্যে প্রচলিত একতারা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আমার নিজের ব্যক্তিগত মত হোলো পশ্চিম বাংলা অঞ্চলের বাউলদের একতারা সম্পূর্ণরূপে বাংলারই নিজস্ব একতারা। বাংলার বাউলদের এই একতারা একমাত্র তাদেরই হাতে ছাড়া ভারতের আর কোন প্রদেশে দেখা যায় না। এই একতারার ছবি অনেকেই দেখেছেন, তবুও সাধ্যমত এর বর্ণনা করতে চেষ্টা করবো।

সাধারণত পাকা লাউ থেকেই এর সৃষ্টি। বাঁশও বিশেষ প্রয়োজনীয়। গোল ও চেপ্টা লাউ এই প্রকার একতারায় কাজে লাগে না। যে লাউয়ের আকৃতি সরু ও লম্বা, কতকটা মুগুরের মত, তারই নিচের অর্ধেকটা এর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সাধারণত একতারার লাউটি এক বিঘৎ কিংবা আট নয় ইঞ্চি লম্বা থাকে।

নিচের অংশে পাতলা চামড়া লাগান। এস্রাজ ও স্বরোদে আমরা যা দেখি, এই চামড়াও সেই জাতের। লাউয়ের উপরের দিকটা থাকে ফাঁকা। এক থেকে দেড় ইঞ্চি একটি ফাঁপা প্রায় দুহাত লম্বা বাঁশের একদিকের গাঁটটিকে না কেটে, অপর দিক থেকে উপরের গাঁট পর্যন্ত চার ভাগে চিরে ফেলে। মুখোমুখি দুদিক থেকে দুটি অংশকে কেটে বাদ দিয়ে বাকি দুই অংশ ঐ লাউয়ের দুই পাশে বেঁধে দেয়, লাউয়ের গা ফুটো করে, মোটা সুতো, দড়ি বা পাতলা তারে। উপরে গাঁটের ঠিক নিচেই থাকে একটি বাঁশের তৈরি কান। সেই কান থেকে তার যায় লাউয়ের ভিতর দিয়ে নিচেকার মাঝখানটি ফুটো করে। চামড়ার বাইরে একটি কাঠের ছোট টুকরোর সাহায্যে তারটি আটকান থাকে। এছাড়া চায়ের টিনের কৌটোকেও একতারা করে বাজাতে দেখেছি। অনেকে শখ করে কাঁসার তৈরি একতারাও বানিয়ে নেয়।

এই একতারার বাঁশের দুইটি পাতলা ডাণ্ডার যে কোন একটিকে একহাতে চেপে ধরে, হাতের দ্বিতীয় আঙ্গুলে গানের ছন্দে ছন্দে আঘাত করে ঝঙ্কার তুলতে হয়। লাউয়ের অংশটিকে কানের কাছে চেপে ধরে বহু সময় তাদের বাজাতে দেখি। তার একটি প্রধান কারণ হোলো, লাউয়ের ভিতর দিয়ে একতারার শব্দ-ঝঙ্কার যেভাবে কানে বিশেষভাবে ধরা পড়ে, সে রকম আর কোন উপায়ে সম্ভব নয়। তখন মনে হয় জগতটা যেন একটি বিরাট সুরে ডুবে আছে।

কোমরে থাকে ছোট একটি “বাঁয়া”। বাঁ দিকে, সামনে ঈষৎ বেঁকানো। কোমর ও বাঁ কাঁধ থেকে ফিতে দিয়ে ঝুলিয়ে কাপড়ের পাড়ে শক্ত করে বাঁধা। কেবলমাত্র বাঁ হাতে বাঁয়ার উপরে নানা প্রকার শব্দে ছন্দ তুলতে হয় গানের সঙ্গে মিলিয়ে। বাংলা দেশের এই দলের বাউলদের সবচেয়ে বড় গুণ হোলো বাঁ হাতে বাঁয়া-র উপর তাল দিয়ে, ডান হাতে এক আঙ্গুলে

একতারায় তালে তালে ঝঙ্কার তুলে, পায়ে বাউলের কাঁসার বাঁকা নূপুরের শব্দে নৃত্য ও একসঙ্গে গান গাওয়া। এইটি বাউলদের একটি আশ্চর্য ক্ষমতা। আমার মতে বাউলদের এই বিশেষত্বটিও বাংলারই একটি নিজস্ব বিশেষ গুণ।

বাউলরা নাচে গায়। কিন্তু এযুগে নাচিয়ে বাউলের সংখ্যা খুব কম। দল বেঁধে সঙ্কীর্তনের মত নাচতে তাদের কখনো দেখিনি। পূর্বে বাংলা দেশের সব বাউলরাই গান গেয়ে নাচতো কিনা বলতে পারি না। শোনা যায় সুফীদের মধ্যে চিশ্‌তীয়হ ও সুহরবরদীয়হ দরবীশ সম্প্রদায়ের মধ্যে গানে প্রেম প্রকাশের ধারা প্রচলিত, তাকে তারা বলে "সমা" বা গানের বৈঠক। এদের উদ্দেশ্য হোলো গান-বাজনায় অন্তরকে প্রেমরসে উদ্দীপ্ত করা, ভগবৎ প্রেমে বিভোর হওয়া। এই অবস্থাকে কীর্তনের ভাষায় দশায় পাওয়া বলে। অনেকে ঐ সময় ভাবাবেগে নানা দেহভঙ্গী করে বা নাচতে থাকে। অবশ্য সে নাচ কোন নিয়মের দ্বারা যে পরিচালিত তা নয়। তাকে অশিক্ষিত দেহছন্দে তালে তালে ভাবাবেগে এক রকমের লাফানো বলা চলে।

কবি জয়দেবের বাসস্থান বিখ্যাত কেন্দুলী গ্রাম শান্তিনিকেতনের পঁচিশ মাইল পশ্চিমে অজয় নদীর তীরে অবস্থিত। প্রতি বৎসর এই গ্রামে পৌষ-সংক্রান্তি থেকে শুরু করে এক সপ্তাহের মত একটি বিরাট মেলা বসে। এই মেলার প্রধান আকর্ষণ হোলো বাংলার বিভিন্ন স্থানের বাউল ও তার নানা শাখাপ্রশাখায় প্রসারিত সম্প্রদায়ের সম্মিলন। এই সপ্তাহটি তাদের কাছে বড় আনন্দের, কারণ এইখানেই তারা বছরে একবার নিজেদের মধ্যে মেলামেশা, ভাবের ও জ্ঞানের আদানপ্রদানের সুযোগ পায়। এই সময়ে তারা বহু দলে বিভক্ত হয়ে, গানে ও নাচে রাতের পর রাত আনন্দ করে। বহুবার সেখানে গেছি—কতবার এদের বিভিন্ন দলের মধ্যে বসে ওদের গানে

নাচে শীত কাটিয়েছি মশগুল হয়ে। বিগত ৩৫ বৎসরের মধ্যে ছয়-সাত বার ঐ মেলায় গিয়েছি। তাছাড়া শান্তিনিকেতনেও মাঝে মাঝে এ অঞ্চলের বাউলরা এসেছে। কিন্তু নাচের দিক থেকে সব চেয়ে বিশেষ করে আকৃষ্ট করেছে আমাকে তিনটি বাউল। প্রথমটির দেখা পাই ১৯৩১ খৃঃ কেন্দুলীর মেলাতেই। যুবক সেই বাউলটি। অজয় নদের তীরে, একটি আখড়ায় সকালে গাছের ছায়ায় তাকে গান গেয়ে নাচতে দেখি। সুস্থ সবল দেহ, গায়ে ছিল আলখাল্লার বদলে একটি বড় চাদর। দুই আঁচল দুদিক থেকে ঘুরিয়ে এনে ঘাড়ের পিছনে দুটি কোণে বাঁধা। পরনে আর কিছু ছিল না। দাড়ি সামান্য, চুল উপরে চুড়ো করে বাঁধা। একতারা, বাঁয়া ও পায়ে নূপুর সবই ছিল। বহুক্ষণ সে মশগুল হয়ে নেচে গান গায় এবং তার নৃত্যের ভাবভঙ্গী ও বলিষ্ঠতায় সকলেরই মন আকৃষ্ট হয়। আখড়ার অন্যান্য সঙ্গীরা চারদিকে তাকে ঘিরে বসেছে। দলে একজন ছিল চামড়ার তালবাদ্য 'খঞ্জনী' বাজিয়ে। অপূর্ব তার বাজাবার ভঙ্গী। সে সমস্ত অঙ্গ দিয়ে বাজাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে বসে বসে খঞ্জনী হাতে নাচছে। বাউলের নাচে ও খঞ্জনীর বাজনায় সেই দিনের সকালটিতে যে একটি মধুর সঙ্গীত দোলা জাগিয়েছিল, সে আজো আমার মনের মধ্যে গাঁথা আছে। তারপর দেখেছি 'গোপাল ক্ষেপা'কে—ঐ মেলাতেই। সেও বাউলদের মধ্যে সুপরিচিত। নাম শুনে পরে বহুবার শান্তিনিকেতনে এসেছে, গানে নাচে সকলকে আনন্দ দিয়েছে। বার্ধক্যহেতু কিছুকাল থেকে নাচতে চাইত না—এখন আর তাকে দেখি না। বাউলমহলে তার নাচের চেয়ে গানেই ছিল অধিক প্রসিদ্ধি; তবুও মোটামুটি ভাবে সে নাচতে জানতো। 'নবনী গোপাল' বর্তমানে বৃদ্ধ। এর নাম অনেকেরই পরিচিত। এর প্রাণবন্ত নৃত্যভঙ্গীর বৈচিত্র্য দেখবার মত।

এখন কথা হচ্ছে এই বাউলরা যা নাচে সে নাচ কি প্রকারের

এবং তারা তা পেল কিসের থেকে। এদের নাচে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হোলো, এরা গানের প্রত্যেক কথাকে কখনো নাচের ভঙ্গীতে বা মুদ্রাভিনয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে না। দুই হাতে দুই যন্ত্র থাকার দরুন হাতের সাহায্যে কোনপ্রকার অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করবার কোন উপায় এদের নেই। মুখে সাধারণত থাকে আত্মভোলা একটি হাসিখুসি ভাব। দেখে মনে হয় এরা গান শোনায় কেবল কণ্ঠস্বরে নয়, দেহভঙ্গীতেও। গান গেয়ে, নেচে তারা গানের সমগ্র রসটিকে ফুটিয়ে তোলে।

উপরের তিনটি বাউলের মধ্যে প্রথমটির বৈশিষ্ট্য হোলো তার নাচে পুরুষোচিত বলিষ্ঠ তেজ ও প্রাণবান নৃত্যছন্দ। নাচের মধ্যে নারীসুলভ কমনীয় ভঙ্গী প্রায় ছিলই না। গানের কোন কোন অংশ যখন খুব জমাটভাবে গাওয়া হচ্ছে তখন খঞ্জনী ও বাঁয়ার ছন্দে আধবসা অবস্থা থেকে এক পা তুলে লাফিয়ে যখন উঠছিলো, তখন সেই আখড়ায় এমন কেউ ছিল না যে নাচের রসে মুগ্ধ না হয়েছিল। পায়ের বিচিত্র ছন্দের পদক্ষেপে সেখানে মাটি কাঁপিয়ে দিয়েছিল, ধুলো উড়িয়ে দিয়েছিল। সেদিন তার বলিষ্ঠ দেহের গতিভঙ্গীতে যে মাধুর্য দেখেছিলাম সে হোলো মনোমুগ্ধকর শক্তির মাধুর্য।

নাচে 'গোপাল ক্ষেপা' অপেক্ষাকৃত কোমল মাধুর্যের পরিপোষক। তার বয়স একটু বেশী তাই গানের প্রতি তার ঝোঁক ছিল। হালে যাকে দেখেছি, তার নাচে আছে অধিক লালিত্য পূর্বোক্ত নাচিয়েদের তুলনায়। এর নাচে সেই প্রকার পুরুষোচিত বলিষ্ঠ নৃত্যভঙ্গী দেখিনি। কিন্তু আছে বিভিন্ন পদক্ষেপে নাচের গতিভঙ্গীতে বৈচিত্র্য, দেহের নানারূপ দোলন। এর নাচে লালিত্য থাকলেও তা' নারী-সুলভ দুর্বল নয়। শক্তির প্রকাশ তাতে আছে।

এদের নাচে সামনের দিকে বিভিন্ন চলনে এগিয়ে চলাই হোলো প্রধান বিশেষত্ব। বৃত্তাকারে এগিয়ে চলা, সামনে এগিয়ে গিয়ে

পিছিয়ে না এসে ঘুরে গিয়ে আবার সেইমুখী সামনে চলা, এই হোলো এদের নাচের মূল চাল। পাশের দিকে চলতে দেখি না। কিন্তু এক জায়গায়ও অনেকক্ষণ নানা ভঙ্গীতে নাচে। এরা কখনো কোমর দোলায় না বা গলাকে ডাইনে-বাঁয়ে দ্রুতছন্দে কখনো নাচায় না। গানের তাল সাধারণত তিন ও চার মাত্রা ছন্দে। ছন্দ-বৈচিত্র্য আনবার জন্যে গানের মাঝে মাঝে প্রায়ই অন্য ছন্দের নানাপ্রকার অলঙ্কার জুড়তে দেখি।

আমার নিজের ধারণা এ নাচের মূল উৎস হোলো বাংলা দেশের প্রাচীন পাঁচালী গানের আদর্শের নাচ। পাঁচালীতে আগেকার দিনে লোকে গাইত চলে ফিরে, নেচে নেচে। মূল গায়েন একজন, দোহারের দল সঙ্গে। এও কিন্তু খাঁটি নৃত্যাভিনয় নয়। সে নাচ একমাত্র গানের ছন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, কথার উপরে নয়। গানের সময় সাধারণ অভিনয়ে গানগুলি গেয়ে যায়। কখনো পদচালনা থাকে, বেশি সময়েই থাকে না। গানের মাঝে মাঝে যখন কেবল ঢোলে ছন্দ বাজে তখনই বিশেষ করে সেই ছন্দকে নাচে মূর্ত করা এদের প্রধান রীতি। কোন ধরাবাঁধা বিশেষ নৃত্যধারার আঙ্গিকে পাঁচালী গানের নাচ কোনদিনই গড়ে ওঠেনি। যখনই পাঁচালী গাইয়ে আপন ক্ষমতা মত গানের ছন্দে মিলিয়ে নাচতে পেরেছে তখনই তাকে পাঁচালী গানের নাচ বলা হ'য়েছে। যে যুগে বাঙালী সমাজে নাচের চর্চা ছিল—সে যুগে পাঁচালী নাচিয়েদের নৃত্যকৌশল ছিল উন্নত। পরবর্তী যুগে নৃত্যের স্থান সমাজে ছিল না বলে পাঁচালী গাইয়েদের নৃত্যপদ্ধতির অবনতি ঘটে। পাঁচালী গাইয়ের নাচ সাধারণত একলার নাচ।

এখনো কবি গানে, রামায়ণ গানে এই ধরনের পাঁচালী পদ্ধতির চলন আছে। দেখেছি মূল গায়েনকে সাধারণভাবে অভিনয় করতে গান গেয়ে এবং গানের মাঝে মাঝে ঢোলের তালে অঙ্গভঙ্গী ক'রে

নাচতে। আজকালকার 'কবি' গাইয়েদের মধ্যে নাচের বৈশিষ্ট্য বিশেষ নেই। বাংলার খেম্‌টাওয়ালীদের কোমর-দোলানো ও মেয়েলি ধরনের নাচের অঙ্গভঙ্গীতে তারা উৎসাহী। রামায়ণ গানে চামর হাতে মূল গায়েন নাচে, তাকে পাকাপোক্ত নাচ বলা চলে না, তবে নাচের দোলা বা কিছুটা ছন্দ রাখবার চেষ্টা করে পায়ে, দেহে। একজাতীয় কীর্তন গানেও চামর হাতে পাঁচালী আদর্শে নাচ দেখেছি। এই ধরনের একলা গান গেয়ে পদচালনার নাচ আরো কয়েকরকম লোকগীতেও দেখা যায়।

বাউলের নাচ ঐ আদর্শেই গঠিত এক ধরনের পাঁচালী নাচ। কোন একটি বিশেষ রীতিতে বাঁধাধরা নাচ এ নয়। যখন যে বাউল যেখানে যে নৃত্যছন্দ পেয়েছে তাকেই গ্রহণ করেছে সহজভাবে। যতদূর মনে হয় চেষ্টাকৃত কোন নৃত্যরূপ পছন্দ করেনি। গান গাইবার রীতিতে তারা যত প্রকার ছন্দ পেয়েছে তাকেই নৃত্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা থেকেই তাদের নাচের উদ্ভব, বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ। যার নাচতে ভালো লেগেছে সে নেচেছে, যার ইচ্ছা করেনি সে নাচেনি। তাদের গানের আনন্দকে এক সঙ্গে গানে ও নৃত্যে ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এ নাচের উদ্ভব। এ যে স্থূফী দরবেশদের 'সমা'-র প্রেমোন্মত্ততা তাদের গানে ও নাচে সে কথা মনে হয় না। তারা যখন ভক্ত, দরদী বা মরমীদের 'সঙ্গ' করে, তখন তাদের আলাপ আলোচনার ভাষা হোলো গান। তখন গান গাইতে বা গান শুনতে তাদের যে আনন্দ হয় সেই আনন্দই তাদের নাচের মূল প্রেরণা—এ ঠিক প্রেমোন্মাদে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হওয়া নয়।

আসামের নাচ ও গান

১৩৫৪ সালে পুজোর ছুটির শেষদিকে আসামের রাজধানী শিলং শহরে আসামের পার্বত্য জাতিগুলির সঙ্গে সমতলবাসীর মিলন উদ্দেশে একটি বিরাট সম্মিলনী আহূত হয়। আসাম সরকারই এবিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিশেষ ক'রে আসামের তদানীন্তন প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্যর আকবর হায়দরী ছিলেন এর পুরোভাগে। আমার দিক থেকে এই প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণের বিষয় ছিল আগত পার্বত্য ও সমতলবাসী নানা জাতির দ্বারা অনুষ্ঠিত নাচ ও গান। নানা জাতির মিলন উদ্দেশে এধরনের সম্মিলনী পূর্বে নাকি আসামে সম্ভব হয়নি। তার একটি প্রধান কারণ পূর্ববর্তী শাসনকর্তারা কোনদিনই চাননি যে এই সব বিভিন্ন পার্বত্য জাতিরা পরস্পরের সঙ্গে মিলনের সুযোগ পাক বা পরস্পরকে জানুক। এই মিলন-সপ্তাহের দিন স্থির হয়েছিল আঠারোই কার্তিক থেকে চব্বিশে কার্তিক পর্যন্ত। উৎসব উপলক্ষে শিলং লাবান পল্লীর উত্তরে ও ক্রিকেট খেলার মাঠের পূর্বদিকে "পাইনমাউণ্ট" বিদ্যালয়ের নীচের ঢালু জমিতে আসামের নানাপ্রকার কুটীরশিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তা ছাড়া ছিল নাগাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের নানাপ্রকার হস্তনির্মিত জিনিসের প্রদর্শনী ও কিছু ঐতিহাসিক ও মূল্যবান দ্রব্যের ও আধুনিক হাতের কাজের সংগ্রহ। সমগ্র আসামের দিক থেকে বিচার করলে বলা চলে যে এই প্রদর্শনী আশানুরূপ হয়নি। আরো বড়ো ও আরো বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলা সম্ভব ছিল; যাই হোক এ ছাড়া এখানে যে নাচগানের আয়োজন হয়েছিল সেইটিই বিশেষ ক'রে এই প্রদর্শনীর একটি গৌরবের বিষয় ব'লে আমি মনে করি। তখনো পর্যন্ত কোন প্রদেশেই সরকারী কোন

প্রদর্শনী বা সম্মিলনীতে লোকনৃত্য ও গীতকে এইভাবে একত্রে দেখাবার ব্যবস্থা কোন শাসনকর্তাই করেননি। নাচ, গান ও অভিনয় কলার সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের মিলন যে আরও গভীর ও সুন্দর হয় এ কথাটা তারা স্বীকার করেননি, পরীক্ষা করেও দেখেননি। সেজন্যেই বলেছি আসামের এই সম্মিলন একদিক থেকে সত্যই নতুন ও সার্থক।

এই প্রদেশটি বিচিত্র মানব-সমাজে পরিপূর্ণ। ভারতের আর কোন প্রদেশে এত প্রকার জাতি-বৈচিত্র্য বোধ হয় দেখা যায় না। প্রত্যেকের ভাষা ও সামাজিক রীতি-নীতিতেও যথেষ্ট পার্থক্য। পণ্ডিতদের মতে আসামের প্রায় সমস্ত জাতিই মূলতঃ মঙ্গোল জাতির শাখা। এদের মধ্যে অনেকগুলি জাতি আছে যারা না হিন্দু, না বৌদ্ধ, না মুসলমান, না খৃস্টান। তাদের নিজেদেরই রচিত ধর্ম, নিজেদের রচিত সমাজ-ব্যবস্থাই তারা পালন করে।

একথা অনেকেই জানেন যে, পুজোর সময় ভারতবর্ষের পার্বত্য অঞ্চলের প্রকৃতি সবচেয়ে সুন্দর ও আরামপ্রদ। পরিষ্কার আকাশ, অত্যধিক শীত তখন পড়ে না। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে অনেকখানি তফাতে শিলং-এর পাহাড়টি অবস্থিত থাকায় পুজোর সময় হিমালয়ের যে-কোন শহরের তুলনায় শিলং-এর শীত কম। শহরটি পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র নদের পাণ্ডুঘাট বা গৌহাটি থেকে চৌষট্টি মাইল দক্ষিণে। প্রাদেশিক সম্মেলনের পক্ষে সময় ও স্থান যে উপযুক্ত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

নাচ ও গানের আয়োজন করা হয়েছিল প্রদর্শনীর মাঠেই। এর জন্যে ছোট একটি রঙ্গমঞ্চ তৈরি করা হয় খড়ের চালা বাঁশ ও পাহাড়ী পাইন গাছ দিয়ে। দর্শকদের দেখবার স্থান হয়েছিল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। বেশির ভাগ গান ও নাচ ঐ মঞ্চেই সম্পন্ন হয়। কয়েকটি নাচ

স্থানাভাববশত মঞ্চের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে হয়েছিল। প্রতিদিন বেলা চারটে থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলতো। তা ছাড়া এই মিলন সপ্তাহে তিনরাত্রি ধ'রে শহরের একটি সিনেমাগৃহে ও খৃস্টানদের একটি কলেজের রঙ্গমঞ্চে টিকিট ক'রে নাচের আলাদা ব্যবস্থা হয়েছিল।

আঠারোই কার্তিক বিকাল থেকে নাগাদের অনুষ্ঠান শুরু হোলো নাচ ও গান দিয়ে। সংখ্যায় এরা খুব বড় দল, সকলেই পুরুষ। দুই দলে ভাগ ক'রে ওরা নাচলো যুদ্ধের নাচ। যেন দুই দল পরস্পরকে আক্রমণে উদ্যত। হাতে ছিল সে-দেশী বল্লম ও দা। সমস্ত নাচেই যেন বল্লম দিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করার ভাব। হঠাৎ লাফিয়ে উপরে ওঠা, কখনো লাফাতে লাফাতে এগিয়ে যাওয়া, পিছিয়ে আসা, কখনো পাশে চলা ; দেখে মনে হয় যেন সবটাই সম্মুখ-যুদ্ধের কায়দা। নাচের পদ্ধতিতে এই রকম লাফ দিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে ওঠা বসা চলা ফেরার মধ্যে প্রচণ্ড একটা শক্তির পরিচয় মেলে। কয়েকটি নাচে দল বেঁধে সুর ক'রে সকলে গান গাইলো, শুনে মনে হয় কেবল যেন দুটি স্বর বের হচ্ছে। হাত ধ'রে সকলে একসঙ্গে একটি নাচ নাচলো তাতে কোন প্রকার যুদ্ধের অভিনয় ছিল না। ছিল কেবল কতকগুলি বিশেষ পদক্ষেপ। এই নাগা দলটি তাদের সঙ্গে মেয়েদের আনেনি। শুনলাম তারা নাকি অপেক্ষাকৃত সভ্য, তাই মেয়েদের বাদ দিয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে গত যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল ব'লে অল্পবিস্তর হিন্দিও বলতে পারে।

খাসিয়া মেয়েদের সাজ খুব জমকালো, পুরুষদেরও মন্দ নয়। মেয়েদের মাথায় ছিল রুপোর মুকুট, দেহে ছিল নানা প্রকার গয়না ও কাজ-করা জামাকাপড়ে আবৃত। ছেলেদের হাতে চামর, মালকোঁচা মেরে কাপড় পরেছে, পায়ে সাধারণ চামড়ার জুতো। মাথায় পাগড়িতে পাখীর পালক গোঁজা। খাসিয়া মেয়েদের নাচের

বিষয়ে গল্প শুনেছি যে সাহেবরা এ নাচের নাম দিয়েছে "পিঁপড়ে মারার নাচ"। দেখার পরে বুঝলাম নামটির তাৎপর্য কোথায়। ডাঙার শামুক যখন চলে তখন মাটিতে তার দাগ দেখে ধরা যায়, সে চলছে। এই মেয়েদের নাচ ঠিক সেই রকমের। দেখলাম গম্ভীর মুখে ছোট মেয়ে থেকে শুরু ক'রে বয়স্কা যুবতীর দল প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। এলোমেলো। দুই পা একসঙ্গে জোড়া। বাজনার তালে তালে তারা পায়ের আঙুল টিপে টিপে একটু একটু ক'রে এগুচ্ছে যার যেদিকে সুবিধা। নিজের প্রয়োজন মত বেরিয়ে এলো, আবার যোগ দিল—সমগ্রভাবে নাচের দিক থেকে কোন বাধা দেখা দিল না। পুরুষের দল সহজ একটি পদক্ষেপেও বেশখানিক দ্রুত লয়ে, হাতে চামর দোলাতে দোলাতে, নৃত্যছন্দে মেয়েদের মাঝখানে রেখে চারিদিকে গোল হয়ে ঘুরতে লাগলো। এ নাচে কোন গান নেই—সঙ্গে বাজছে দুরকমের ঢোল ও সে-দেশী একটা শানাই জাতীয় যন্ত্র। সুরটিও মাত্র দু'তিনটি স্বরের উপর গঠিত। এই নাচের শেষে, বড় একটি ঢোলকের সাহায্যে দুজন ক'রে খাসিয়া পুরুষ তলোয়ার হাতে পরস্পরে মুখোমুখি তফাতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের নৃত্য করতে লাগলো। দেখতে কতকটা মহরমের অসিনৃত্যের মত যুদ্ধের পাঁয়তারা। শেষ দিকে দুজনে কাছাকাছি এসে তলোয়ারে তলোয়ার ঠেকিয়ে নমস্কার ক'রে নাচ শেষ করে। প্রায় ষোল জন লুসাই সৈন্যদের নাচ দেখলাম। কিন্তু এরা নিজেদের সাজপোশাক বর্জন ক'রে সাধারণভাবে খাকী হাফ্ প্যাণ্ট ও গেঞ্জি গায়ে ও পায়ে বাটার কাপড়ের জুতো প'রে নাচের প্রাঙ্গণে নামলো। এদের যারা এনেছিলেন তারা যে কেন এ বিষয়ে কোন দৃষ্টি রাখেননি তাই ভেবে আশ্চর্য হ'লাম। এই নাচেই প্রথম লক্ষ্য করলাম প্রত্যেক নাচিয়েরা বিছানার চাদরের মাপে, তাদের দেশী তাঁতে বোনা মোটা ও নানা ডোরাকাটা চাদর দুই হাতে দুই কোণে ধ'রে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে

দিয়েছে। সকলে একসঙ্গে ও এক নিয়মে ঐ চাদরটির দুই কোণ দুই হাতে নানা ভঙ্গীতে গুটোচ্ছে ও ছড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ একরকম পদক্ষেপে তারা এগিয়ে চলেছে। সব শেষে যে নর্তকটি ছিল সে বিদূষকের অভিনয় করছিল। যেন নাচটি তার জানা নেই। দেখে দেখে নাচতে হচ্ছে এবং তা সত্ত্বেও যেখানে-সেখানে ভুল হচ্ছে। সঙ্গে বাজছিল একটি চামড়ার বাদ্য ও নানা ছন্দে দু'তিন স্বরের তিনটি ঘণ্টা। চাদর হাতে নাচের ভঙ্গী দেখে আমার মনে পড়ছিল জাভার কথা। চাদর হাতে আর একটি নাচ দেখলাম। এ নাচ মেয়েদের নাচ। ঠিক একই পদ্ধতিতে চাদরটি ধরা ছিল। কিন্তু হাত চালানোর ভঙ্গীটি এক নয়। অর্থাৎ ডান হাত যখন কোমরে বাঁ হাত তখন উপরে তোলা, আবার বাঁ হাত কোমরে থাকলে ডান হাত থাকবে উপরে। এই নাচের সঙ্গে কৃষ্ণ-রাধার বিষয় নিয়ে গান গাওয়া হয়েছিলো। অল্প জায়গা নিয়ে নাচটা হচ্ছিল দুই পায়ে একসঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে। এ নাচটা নাকি গোয়ালপাড়া ধুবড়ি অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত।

আসামের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পাহাড়ে বাস করে "আবর" নামে একটি জাতি। সেই জাতের ষোলটি অল্পবয়সের মেয়ে, তাদের মাথার চুলগুলি টুপির মত গোল ক'রে কাটা। সাঁওতালদের মত কোমর ধ'রে প্রথমে নাচ শুরু করলো। পরে কোমর ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে আরো কতগুলি সহজ হাতের ভঙ্গীতে কখনো এক সারিতে, কখনো গোল হ'য়ে নেচে গেল। মাঝখানে ছিলো একটি বয়স্ক পুরুষ ডান হাতে তার তলোয়ার। মেয়েদের গানের সঙ্গে নাচের তালে তালে তলোয়ারটি নাড়া দিয়ে সে ঝমঝম শব্দ করছিল। এ ছাড়া কোন চামড়ার তালযন্ত্র দেখিনি।

"কাচেরী" জাতি আসামের সর্বত্র ছড়ানো। এই দলে নাচের জন্য তিনটি যুবতী, বাজনায় একটি বাঁশী বাজিয়ে, একটি বড় চামড়ার ঢোল-

বাজিয়ে পুরুষ ও মন্দিরা বাজিয়ে একজন বয়স্কা মহিলা ছিল। আরম্ভের নাচে বলিষ্ঠ একটি মেয়ে ডান হাতে তলোয়ার, বাঁ হাতে গামছা নিয়ে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গীতে পরিশ্রমের নাচ দেখালো। নৌকাচলার নাচ, ধানকাটার নাচ ও তলোয়ারের নাচ, কিন্তু হাতের তলোয়ারটি নৌকার নাচ ও ধানকাটার নাচে একবার বৈঠা একবার কাস্তের কাজ করলো। বাকি দুটি মেয়ে আরম্ভে একসঙ্গে তাদের বিয়ের নাচ দেখাল। অল্প জায়গার মধ্যে দুটি মেয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দু' হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে তালে তালে দুলে দুলে এগিয়ে পেছিয়ে ঘুরতে লাগল। এদের সাজ-পোশাকের কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। নিজেদের বাড়িতে যে রকম কাপড় পরে সেই ভাবেই এসেছে—বাংলাদেশের মেয়েদের মত কাপড় পরা। শেষের নাচটিতে একটি মেয়ে দু'হাতে একটি চাদরের দুটি কোণ ধ'রে পর্যায়ক্রমে একহাত কপালে ঠেকিয়ে তালে তালে একবার একপাশে আর একবার অপর পাশে নুয়ে যখন বসছিল ও উঠছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন দুঃখে ভারাক্রান্ত। অবশ্য এটিও বিয়ের সময়কার নাচ ব'লেই মনে হয়—মেয়ের বাপের বাড়ি যাবার বেদনাটাই যেন এ নাচে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

"সারদুক্‌পেন্"-দের নাচের সাজপোশাক ছিল দেখবার মত। এরা ভুটানের পূর্বদিকে আসামের অন্তর্গত হিমালয়ের বাসিন্দা। এরা প্রথমে পাঁচ জনে নাচলো, দুজনের মুখে মুখোস, কতকটা জন্তুর মত। একজন পুরুষ, অপর দুজন মেয়ে। এই নাচের ধরণ অনেকটা উন্নত। বাজনার মধ্যে একটি মাত্র চামড়ার বাদ্য কাঠি দিয়ে বাজানো হচ্ছিল। এদের নাচে ও সাজে ভুটান বা তিব্বতীদের প্রভাব খুব বেশী। শেষকালে যে নাচটি দেখালো সেটিই সকলকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছিল। দুটি মানুষ বাঁশের বাতা ইত্যাদি দিয়ে প্রকাণ্ড একটি শিংওয়ালা গরু সেজেছিল—তার পিঠে ছিল দুহাত উঁচু একটি পুতুল,

যেন গরুর পিঠে ব'সে আছে। মুখোস-পরা আরো চারজন লোক গরুটার সঙ্গে সঙ্গে নাচতে নাচতে চলেছে। ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল যেন গরুটা ক্ষেপে গেছে, এই চারজন লোক তাকে কিছুতেই বশে আনতে পারছে না। গরুটা ইচ্ছামত এপাশে ওপাশে চলছে, লাফাচ্ছে বাজনার তালে তালে। কখনো ঘাড় কাত ক'রে শিং বেকিয়ে ওদের তাড়া করছে, কখনো গাধার মত পিছনের একপায়ে লাথি ছুড়ছে। যে দুজন গরু সেজেছিল, তারা চলাফেরা লাফানো পা ছোড়ায়, পরস্পরের সঙ্গে খুব মিল রেখে চলছিল। কোন প্রকার চলনে, লাফানোয় এতটুকু একতার অভাব দেখা যায়নি। এদের এই নাচে ও বাজনায় তিব্বতী বৌদ্ধমঠের মুখোস-নাচের সঙ্গে অনেকখানি মিল আছে।

সবচেয়ে খারাপ লেগেছিলো লুসাই ও জয়ন্তিয়া অধিবাসী খৃস্টান সম্প্রদায়ের নাচ ও গান। লুসাই খৃস্টান পুরুষ ও মেয়েরা সাজে, পোশাকে, গানে ও বাজনায় হুবহু এক-একটি সাহেব, কেবল দেহটা ও গানের কথাটা লুসাই। জয়ন্তিয়াদেরও ঠিক তাই: তবে এদের দলে বড় মেয়ে ছিল না, ছোট মেয়েদের দিয়ে কয়েকটি নাচ দেখিয়েছিল। তার মধ্যে দু'একটি ছিল "কিণ্ডার গার্টেন" শিক্ষা-পদ্ধতির মত অভিনয়গীত। বাকী কয়েকটি নাচ রুচিহীন। ওদের নাচ দেখে মনে হয়েছিল যে এই ধরনের সাধারণ বিলেতী গান বাজনাকে প্রদর্শনীতে স্থান না দিয়ে আসামের এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের নাচ ও গান রাখলেই হ'তো। অন্তত এদের চেয়ে ঢের উঁচুস্তরের ইয়োরোপীয় সংগীত তারা শোনাতে পারতো। আসামের পাহাড়ী জাতের মধ্যে খৃস্টান পাদ্রীদের প্রভাব খুব। তারা ধর্মান্তর করণের কাজ চালিয়ে আসছে একশো বৎসরের উপরে। তাদের বিলিতী শিক্ষায় দীক্ষিত করেছে, তাই নিজস্ব সংস্কৃতির কোন পরিচয় এদের গানে, নাচে ও শিল্পে পাওয়া গেল না।

একদল নাগা এসেছিল নাচতে নিজেদের জাতীয় পোশাক না ব্যবহার ক'রে। জুতোমোজা, হাফ্ প্যাণ্ট, শার্ট ও সোয়েটার ইত্যাদি ছিল তাদের গায়ে। চারজন ছেলে ও চারজন ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে নাচলো। কখনো মুখোমুখী দুই সারিতে, কখনো গোল হয়ে ঘুরে, কখনো দুইভাগে ব'সে। সঙ্গে ছিল চারটি ঢোল। একটি এনামেলের ছোট থালাতে কাঠি দিয়ে তাল রাখছিল মন্দিরার মত। মাঝে একবার একজন তলোয়ার হাতে যুদ্ধের ভঙ্গীতে নেচে গেল। সব শেষের নাচটাই ছিল একটু হাস্যকর। একটি লোক মাথায় একটি পাগড়ি বেঁধে সেই পাগড়ির এক প্রান্তে গোল ক'রে কিছু ভারী জিনিস বেঁধে কপাল থেকে আধ হাত ঝুলিয়ে দিয়েছিল। কোমরে ঠিক সেই রকম কাপড় বাঁধা। লেজের মত পিছনে হাতখানেক আঁচলা ঝুলছে। ডগাটিও ঠিক মাথার মত গোল একটি বলের মত ভারী জিনিসে বাঁধা। সে এই দুটি গোলাকার পদার্থকে বাজনার তালে তালে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বাঁদর নাচের মত লাফাতে লাফাতে ঐ গোলাকার পদার্থ দুটিকে ঘোরাতে লাগলো। এই দৃশ্যটিতে দর্শকমহলে বেশ হাসির রোল ওঠে। নাচের ধরনটা ঠিক বাঁদরের নাচের মত। এটি সৈন্যদলের তৈরি একটি আধুনিক নাচ।

আসামবাসী একদল উড়িয়া পুরুষ সত্যনারায়ণের গানের সঙ্গে ঢোলক বাজিয়ে নাচ দেখিয়েছিলো—সাজপোশাক অতি সাধারণ। গানের ধরনটা ঠিক ঝুমুর গানের মত। একজন মূল-গায়েন ও সঙ্গে দোহার। মূল-গায়েনের সঙ্গে সকলে দু'লাইন গান গেয়েই ঢোলের ছন্দে খানিকটা নেচে নেয়। নাচটায় স্ফূর্তি ও ছন্দবৈচিত্র্য ছিল খুব।

উত্তর-পূর্ব পাহাড়ী অঞ্চলে মিরিদের নাচেও বৈশিষ্ট্য কিছু দেখলাম না। নাচলো চার জন পুরুষ। এরাও ঝুমুর গানের মতনই তাদের ভাষায় গান গাইলো ও বাজনার তালে তালে অঙ্গভঙ্গী করলো যাকে নাচ বলা চলে না। মনে হলো এরা জাতে মিরি হলেও

নিজেদের বিষয়ে কিছু বিশেষ জানে না। তাদের সাজপোশাক দেখে মনে হয় তারা এ যুগের সভ্যতার আলো পেয়েছে।

আসামী ও কয়েকটি বাঙালী মিলে যে দু'রাত্রি রঙ্গমঞ্চে নাচ দেখালো সে বিষয়ে আলাদা ক'রে কিছু বলবার নেই। সে ধরনের নাচ আজকাল কলকাতা শহরের শখের ও আধা-ব্যবসায়ী নাচের অনুষ্ঠানে প্রায়ই দেখা যায়—হুবহু সেই আদর্শেই গঠিত। অনেক কিছু চমক-লাগা ঘটনা ও গল্প নিয়ে তারা যা দেখালো তার মধ্যে প্রশংসা করবার কিছুই পাইনি। আসামের কোনপ্রকার নৃত্যের বৈশিষ্ট্য তাতে ছিল না—মাত্র দু'একটি ছাড়া। আধুনিকতার উৎসাহে নতুন কিছু করতে গিয়েছে তারা, কিন্তু এই সম্মিলনীর অনেক নাচের তুলনায় যে তারা অতি নিম্নস্তরের নাচ দেখিয়েছিল, একথা না বলে পারা যায় না।

শিলচরের 'ধামাইল' ও 'বউনাচ'

শিলচরে, বাংলার গ্রামসমাজে একসময়ে অতি-প্রচলিত, অথচ অধুনা লুপ্তপ্রায়, মেয়েদের দুটি নাচ দেখে মনে হলো যে, বাংলার মেয়েদের প্রকৃতির সঙ্গে মেলে এমন কোন নাচ যদি থাকে ত এই দুটিই হ'ল তার খাঁটি নমুনা।

নাচ দুটি দেখালেন শিলচরের সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। বিদ্যালয়টি ১৯৪০ খৃস্টাব্দে ৺কামাখ্যাপদ ভট্টাচার্য নামে একটি তরুণ যুবকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তার পর থেকে তাঁরই অপর ভ্রাতা ও ভগিনীরা এটিকে অক্লান্ত পরিশ্রমে চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে প্রাদেশিক সরকার বিদ্যালয়টিকে অর্থ সাহায্য করেন।

বিদ্যালয়টি যদিও অন্যান্য শহরের সঙ্গীতবিদ্যালয়ের মত এযুগের গান-বাজনা ও মণিপুরী নাচ শেখাবার জন্যেই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে বাংলার প্রাচীন সংগীত ও নৃত্যের প্রতি মমতার পরিচয় পাওয়া গেল। সেখানে গ্রামের প্রাচীন গান ও নাচের চর্চা হয়। গ্রামের নানাপ্রকার অপ্রচলিত গানও তাঁরা সংগ্রহ করছেন। বিদ্যালয়ের সাহায্যে শহরের ছেলেমেয়েদের তা শেখাচ্ছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সকলেই শহরের স্কুল ও কলেজে পড়ে। তাদের মধ্যে এযুগের বাংলা গান, হিন্দি গান ও মণিপুরী বা Oriental নামে তথাকথিত নাচের প্রতি ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। তাই প্রথমে যখন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঐ দুটি প্রাচীন নাচ শেখাবার কথা উঠলো, তখন দু-চারজন ছাড়া শহরের

অনেকেই একাজে উৎসাহ দেখাননি। একবার আসামে সর্বভারতীয় 'বুনিয়াদি' শিক্ষার বাৎসরিক সম্মেলন বসে, তখন এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আমন্ত্রণ করা হয় শিলচর অঞ্চলের গ্রাম-প্রচলিত দেশী নাচ দেখাবার জন্যে। বিদ্যালয়ের পরিচালকরা কি নাচ সেখানে দেখাবেন তাই নিয়ে মহা ভাবনায় পড়েন। শিলচরের বৃহৎ মণিপুরী সমাজের মধ্যে মণিপুরী নাচ আছে। সে নাচ মণিপুরের দলই দেখাবে। তাই তাদের দিক থেকে একই নাচ দেখানোর অর্থ হয় না। অনেক ভেবেচিন্তে গ্রামের ঐদুটি প্রাচীন নাচই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা সম্মেলনে দেখানো স্থির হল। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের অনেকেই তাঁদের ঐ পরিকল্পনাকে সমর্থন করতে পারেনি। তাঁরা হয়তো ভেবেছিলেন শহরের ছেলেমেয়েরা এযুগে যাকে আধুনিক বলে, সেই রকমেরই কোন নাচ তৈরি ক'রে মেয়েদের দিয়ে দেখানোই ভালো। কিন্তু সুখের বিষয় বিদ্যালয়ের পরিচালকেরা তাতে কান দেননি। সাহস করে শিলচরের ঐ প্রাচীন নাচ দুটিই মেয়েদের শিখিয়ে "বুনিয়াদি" শিক্ষা সম্মিলনে দেখালেন। সেখানে নাচ দুটি সমাদর পেল।

আমাকে যখন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের বিদ্যালয়ে একদিন গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নাচ ও গান দেখবার ও শোনবার জন্যে, তখন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বোধ হয় শিলচর অঞ্চলের মণিপুরীদের নাচ কিম্বা এযুগে শহরে প্রচলিত আধুনিক ভীল নৃত্য, শিকার নৃত্য বা সাপুড়ে নৃত্য দেখাবে। আলোচনা প্রসঙ্গে যখন ঐ অঞ্চলের প্রাচীন নাচ দুটির কথা উঠলো তখন আমি সেই দুটি দেখবার জন্যেই আগ্রহ প্রকাশ করি। পরিচালকরা আমার উৎসাহ দেখে উদ্যোগী হলেন, কিন্তু যে মেয়েরা নাচবে তাদের মধ্যে ঐ নাচ দেখাবার উৎসাহ কম বলেই মনে হল। তারা বোধহয় ভেবেছিল, গ্রামের ঐ নাচ

বউনাচ—শিলচর

বউনাচ—শিলচর

বউনাচ—শিলচব

বউনাচ—শিলচর

বউনাচ—শিলচর

বউনাচ—শিলচর

ছুটিতে তাদের নৃত্যনৈপুণ্যের সঠিক পরিচয় তারা প্রকাশ করতে পারবে না। ভাবল শান্তিনিকেতনবাসী আমার কাছে ও-নাচ দেখানো নিরর্থক। যাই হোক শেষ পর্যন্ত তারা সেই নাচই নাচতে রাজী হল।

প্রথমে নাচল সঙ্গীতবিদ্যালয়ের ও শিলচর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী রেবা নাথ, গ্রামের একটি বালিকা বধূর সাজে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে, একলা। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা গান ধরল "চাঁদবদনী ধনি নাচত দেখি", খাঁটি দেশী সুরে ও দেশী উচ্চারণে। গ্রাম্য ঢাকের ছন্দে ও তালে প্রথমে ঢিমালয়ে গানের সঙ্গে নাচটি শুরু হলো। বধূসাজে মেয়েটিও পা দুটি কাছাকাছি সমানভাবে রেখে, অল্প একটু হাঁটু মুড়ে, সামনে ঝুঁকে কেবল দুই হাতের পাতা নানাভঙ্গীতে দোলাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য করলাম যে, মেয়েটি হাঁটু মুড়ে থাকলেও গানের ছন্দে ছন্দে ঈষৎ ওঠানামার একটা দোলা সর্বদাই রেখে চলছে তার দেহে। মেয়েটির পা দুটি কখনো মাটি ছেড়ে উঠছে না। আগাগোড়াই মাটিতে পা ঘষে ঘষে, তার ডানদিক লক্ষ্য রেখেই চক্রাকারে ছন্দে ছন্দে সরে সরে যাচ্ছে। এই নাচে পদচালনার বৈচিত্র্য অল্প। মাত্র তিনটি ভঙ্গী। সেই কটির ছবি দেওয়া হল। হাতের ভঙ্গীর বৈচিত্র্য পায়ের চেয়ে কিছু বেশী কিন্তু খুবই সহজ। এত সহজ হয়েও গানের রসে, বাজনার ছন্দে ও বালিকার বধূজনোচিত ভয় ও সলজ্জভাবের মিশ্রণে নাচটি অত্যন্ত মধুর লেগেছিল।

এই নাচটিকে এ অঞ্চলে বলা হয়েছে "বউনাচ"। আমার পাশে শহরের প্রাচীন ব্যক্তি যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, ৫০।৬০ বছর আগেও তাঁদের গ্রামের বাড়িতে তাঁরা ঐ নাচ দেখেছেন। সে যুগে প্রথা ছিল যে, বিয়ের পর বাড়িতে নতুন বউ এলে একদিন

বাড়ির বয়স্ক মহিলারা গানের সঙ্গে সঙ্গে তার নাচের পরীক্ষা নিতেন। গ্রামের ঢুলিকে ঐ উপলক্ষে ডাকা হত। বয়স্ক মহিলারা গান গাইতেন। সে যুগে নতুন বাড়িতে নতুন বউয়ের পক্ষে নাচ দেখানো যে কতখানি সংকোচের বিষয় ছিল সেকথা অনুমান করা কঠিন নয়। এ নাচ হাত ধরে কেউ কাউকে শেখায় না। বড়দের নাচ দেখতে দেখতে আপনা থেকেই মেয়েরা নাচগুলি আয়ত্ত করে। তাই গানের সঙ্গে নির্ভুল নাচ দেখাতে পারলে নতুন বাড়ির গুরুজনেরা যে সন্তুষ্ট হবেন, এই কথা মনে করে তারা নাচে উৎসাহিত হত। কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল, আজও অশিক্ষিত নিম্নবর্ণের গ্রামবাসী মেয়েরা এ নাচ কোন কোন গ্রামে নাচে। তাদেরই একজনকে সংগ্রহ করে এই বিদ্যালয়ে মেয়েদের অনেক চেষ্টায় শেখানো হয়েছে। তাল ত্রিমাত্রিক ছন্দের। একটু একটু করে গানের লয় দ্রুত হতে লাগল, নাচও সেই লয়কে অনুসরণ করে চলল। শেষদিকের নাচটি দ্রুত ছন্দে খুবই জমে উঠল। নাচটি সম্পূর্ণ শেষ হতে সময় নিয়েছিল ১২ থেকে ১৫ মিনিটের মত।

একটু বিশ্রামের পর ৬টি মেয়ে, বাঙালী মেয়েদের মত মাথায় কাপড় দিয়ে শাড়ি পরে গোল হয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গেই গান শুরু হল "যুগল মিলন হইল দেখ সখি শ্যামের বামে রাই দাঁড়াইল।" আগের গানটির মত এ গান এবং নাচও আরম্ভ হল ঢিমালয়ে, কিন্তু ধীরে ধীরে দ্রুত ছন্দে বাড়তে লাগল। এ নাচটির নাম "ধামাইল"। অনুমান করি গানগুলিকে ধামাইল গান বলা হয় বলেই বোধ হয় নাচগুলিও সেই নামেই পরিচিত। এই নাচটি গ্রামাঞ্চলের সমাজে জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত নানা উৎসব উপলক্ষে এবং বিশেষ বিশেষ ব্রতানুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। সূর্য-ব্রতের সময় সূর্যোদয়ের পূর্বেই হয় এই উৎসবের আরম্ভ। সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে থেকে নৃত্য সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান গাওয়া হয়, সূর্যাস্তের পর রাধা-কৃষ্ণের

ধামাইল—শিলচর

মিলনের গান গেয়ে এই উৎসবের সমাপ্তি হয়। সব উৎসব অনুষ্ঠানে এই নাচের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের লীলার গানই কেবল গাওয়া হয়। এই ধামাইল নাচটি লুপ্তপ্রায় নয়। আজও শিলচরের গ্রামাঞ্চলে অনেক জায়গায় দেখা যায়।

এই দলবদ্ধ নাচটি উপরোক্ত বউনাচের মত শান্ত প্রকৃতির নয়। তার তুলনায় অনেকটা জোরালো। পা তুলে মেয়েরা নাচল। পায়ের ভঙ্গীর বৈচিত্র্য আগের চেয়ে কিছু বেশী। হাততালিই হল এ নাচের একটি বিশেষত্ব। প্রত্যেক পুরো পদচালির সঙ্গে নানা ছন্দে একবার করতালি থেকে সাতবার পর্যন্ত করতালিতে শব্দ করে তারা নাচল।

পুরো এক পদচালিতে অধিকসংখ্যক করতালি সন্নিবেশ করা বিশেষ দক্ষতার পরিচয়। করতালি দিয়ে নাচবার সময় সামনে ঝুঁকে পড়ে। হাতের ভঙ্গীও বউনাচের চেয়ে বেশী। কখনো বাঁ হাত কোমরে দিয়ে কেবল ডান হাতে ভঙ্গী করে, কখনো দুহাত খুলে, কখনো কাপড়ের খুঁট একহাতে ধরে অন্য হাতে কোঁচড় থেকে যেন কিছু দিচ্ছে এই রকম ভঙ্গী করে নাচতে লাগল। বৃত্তাকারে ডানদিকে পাশাপাশি কিম্বা একজনের পিছনে অপরে থেকে ঘুরতে লাগল। এ নাচটি শেষ হতে সময় লাগল প্রায় মিনিট পনরোর মত।

শিলচরে দেশী গানের সঙ্গে ঐ নাচের ভিতর দিয়ে আমাদের যুগ-যুগান্তরের বাঙালী মেয়ে-বউদের নির্মল, বলিষ্ঠ ও আনন্দময় জীবনের একটি সত্যকার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

বাংলা দেশের যাত্রাভিনয়

ভারতবর্ষে "যাত্রা" কথাটির ব্যবহার একমাত্র বাংলা দেশেই আজকাল প্রচলিত। বাঙ্গালীরা "যাত্রা" অর্থে এমন এক ধরনের নাটকের অভিনয়কে বোঝে যে, যার জন্যে শহরের মত রঙ্গমঞ্চের দরকার হয় না। চারিদিক খোলা, বাঁশের বা কাঠের খুঁটিতে টাঙ্গানো মাথার উপরে সামিয়ানা। জমিদার বাড়ির পুজোর দালানের সামনে কাঠের বা থামের উপর বিরাট আটচালা বা ইটের বাঁধানো থামেব উপর ছাদ বসানো যে মণ্ডপ থাকে, তারই ঠিক মাঝখানে একটি অভিনয় উপযোগী গোলাকার বা চতুষ্কোণ স্থান ফাঁকা রেখে, তাকে ঘিরে বসে ঐক্যতান বাদক দল, প্রম্পটার ইত্যাদি সকলে।

তাদের পরেই চারিদিকে বসে যায় দর্শকের দল। সাধারণ-আঙ্গিনায় অভিনয় স্থল মাটি দিয়ে হাত খানেক উঁচু করতে দেখেছি অনেক জায়গায়। গ্রামাঞ্চলে এতদিন বিজলিবাতি ছিলো না, তাই জোরালো পেট্রোমাক্স জাতীয় বাতি ঝুলিয়ে আলোর কাজ সারা হতো। আগেকার দিনে বড় বড় জমিদারদের বাড়িতে ঝাড়লণ্ঠন জাতীয় কেরোসিন বা মোমের বাতি দেখেছি। সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলেও বিজলি বাতি দেখা দিয়েছে। সুখের বিষয় এখনো মাইকের ব্যবহার তাদের মধ্যে শুরু হয়নি। অভিনেতারা সাধ্যমত উঁচু সুরে গান গায়, কথা বলে। তাতেই শতশত দর্শকের কানে তারা তাদের কথা বা গান পৌঁছে দিতে পারে। দর্শকদের জন্যে চেয়ার দরকার হয় না। সকলেই বসে মাটিতে সতরঞ্চি বিছিয়ে। অভিনেতাদের অভিনয় স্থানটি সতরঞ্চি পাতা সেই মাটিরই উপরে। যুদ্ধের পর মৃত্যুর দৃশ্য

সহসা আগমন অন্তর্ধান থাকলেও সেই অভিনেতাদের কিছুই আসে যায় না। দর্শকেরা দেখে, সকলের সামনে দিয়েই অভিনেতারা রঙ্গস্থলের বাইরে চলে যাচ্ছে বা বাইরে থেকে হেঁটে এসে সহসা আবির্ভাব বা অন্তর্ধানের দৃশ্যের অবতারণা করলো। বড় বড় শহরের থিয়েটার বিলাসী দর্শকদের কাছে এ ধরনের দৃশ্য হাসির খোরাক যোগায়, কিন্তু গ্রামবাসীদের কাছে এটা অতি নগণ্য জিনিস। তারা মনে করে যাত্রার অভিনয়ে এটিই স্বাভাবিক। এর প্রতি তারা মোটেই কোন গুরুত্ব আরোপ করে না। তাদের কাছে যাত্রার মূল বিষয়বস্তুই হলো প্রধান।

অভিনয় সচরাচর আরম্ভ হয় রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পরে। শেষ হতে রাত ভোর হয়ে যায়। অভিনেতাদের একটি সাজঘর করে নিতে হয় রঙ্গস্থলের নিকটবর্তী কোনো এক ঘরে বা কোন বাড়ির বারান্দাকে আড়াল করে। যেখানে কাছাকাছি বাড়ি ঘর নেই সেখানে তালপাতা বা খড়ের ঘর তৈরি করে; সেখান থেকে হেঁটে আসে অভিনেতারা রঙ্গস্থল পর্যন্ত, আবার সেই ভাবেই ফিরে যেতে হয় সাজঘরে। দর্শকদের মাঝখান দিয়ে একটু সরু পায়ে হাঁটার পথ থাকে এর জন্যে। প্রথমেই সুরু হয় ঐক্যতানে কন্‌সার্ট সংগীত। কন্‌সার্টের বাজনা হল আজকাল, হারমনিয়ম, ক্লারিয়োনেট, কর্নেট, ট্রাম্পেট, বেহালা, ঢোল, তবলা, বাঁয়া ও মন্দিরা। ২০।৫০ বছর আগে হারমোনিয়মের সঙ্গে বেহালা যন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার ছিল। কর্নেট-ট্রাম্পেট তখন ছিল না। যাত্রার দলের প্রম্পটার-এর হাতে একটি ভারী কাঁসার ঘণ্টা থাকে, সেটির শব্দে ঠিক সময়ে অভিনেতাদের প্রবেশের ইঙ্গিত করা হয়। যাত্রার ঐক্যতান বাজনার সময় ঢোলের তাল বাজে কতকটা পাখোয়াজের বাজনার ঢংএ। গানের ও নাচের সময় বাজে তবলা বাঁয়া। যাত্রার সখীদের নাচের প্রাধান্য ছিল খুব। আজকাল তা ধীরে ধীরে কমে আসছে। আর থাকে দর্শকদের মনরঞ্জে

হাল্কা আমোদে খুশি করবার মত গান ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক রকমের হাসির নাচ। সাধারণত এ নাচে একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে সাজে। যেমন জেলে-জেলেনী, ঘেসেড়া-ঘেসড়াণী ইত্যাদি। কখনো একলার নাচও থাকে সং সেজে হাসির গানের সঙ্গে। এই নাচের আসল উদ্দেশ্য হল সমগ্র রাত্রি ব্যাপী অভিনয়ের মাঝে মাঝে একটু হালকা রসের অবতারণা করা। যাত্রা দলের ওস্তাদ নাচিয়েরাই এই নাচ অধিক করে। সখীদের ও এদের নাচ বেশ জমে উঠলে বা দর্শকদের মনঃপুত হলে 'এনকোর-এনকোর' ধ্বনিতে যাত্রার আসর মুখরিত হয়ে উঠবে। নাচিয়েরা এই ধ্বনিতে উৎসাহিত হয়ে পুনরায় সেই নাচটি দর্শকদের দেখায়। যাত্রায় পুরুষদের স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় করার রীতি আজও প্রচলিত। কেবল মেয়েদের দ্বারা অভিনীত যাত্রার দলের কথা কদাচিৎ শোনা যেত।

যাত্রার সাজপোশাকে উনবিংশ শতকের শেষার্ধের কলিকাতার থিয়েটারের প্রভাব খুব। রাজা, রাণী, রাজপুত্র, সেনাপতি, মন্ত্রী, সেপাই, সন্ন্যাসী, গ্রামবাসী ইত্যাদি সকলকেই সাজানো হয় ঐ আদর্শে। এই সব সাজের আমদানিও হয় কলকাতার দোকান থেকে।

যাত্রায় গান থাকে প্রচুর। আজকাল দেখা যাচ্ছে গানের বেশির ভাগ অভিনেতারা নিজেরাই গায়। মাঝে মাঝে "বিবেক" নামে একটি চরিত্র রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে অভিনয়ের মাঝখানেই গান করে যায়। এর গানের কথার সঙ্গে নাটকের বিষয়ের যোগ থাকে। অবান্তর বিষয় নিয়ে গায় না। বিবেকের গান গাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই। এর গানের সময় অভিনেতারা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এ যুগে এখনো যাত্রায় গানের প্রাচুর্য থাকলেও পূর্বের তুলনায় তা' কমে গেছে। যাত্রায় গান ব্যবহারের একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। অভিনেতাদের মুখের কোন কথা সাধারণ স্বরে বলার

পরেও তাকে গানের ভাষায়, সুরে ও তালে আর একবার বলানো হয় সেই ভাবটিকে দর্শকের মনে আরো গভীর ভাবে বসিয়ে দেবার জন্যে। তার জন্যেই যাত্রায় গানের এত আদর এবং গানগুলির এত প্রয়োজন।

বছর চল্লিশ আগে যাত্রায় এক দল বিশেষ ধরনের গাইয়ে দেখা যেতো, যাদের বলা হতো "জুড়ি" এবং "ছোকরার দল"। এদের কাজ ছিল অভিনেতাদের হয়ে গানগুলি গেয়ে শোনানো, রঙ্গস্থলে দাঁড়িয়ে। অভিনেতারা সে যুগে কম গাইত। জুড়িরা সাধারণত হতো বয়স্ক। তাদের মাথায় থাকৃত আগেকার দিনের উকিল মোক্তারদের মত কাপড়ের গোলটুপি, গায়ে কালোরঙ্গের চোগা চাপকান। এদের গলা হতো খুব মিহি এবং খুব উঁচু সুরে এরা গাইতে পারতো। ছোকরার দল হতো বয়সে বালক। পরত সাধারণ ভাবে ধুতি চাদর। জুড়ি ও ছোকরারা প্রথম থেকে রঙ্গস্থলেই বসে থাকতো। ঠিক গানের সময় উঠে পড়তো। এক একটি গান জুড়ি বা ছোকরার দলের শেষ করতে সময় লাগতো অনেক। হিন্দি ওস্তাদি গানের মত তান বিস্তার এসব গানে ছিল না। যাত্রার অধিকাংশ গানই ছিল উচ্চাঙ্গের রাগিনী সংগীত ও তার তালে বাঁধা, যাত্রায় জুড়িদের গান গাইবার একটা বিশেষ প্রথা ছিল। এই দল চার সারিতে রঙ্গস্থলের চারদিকে শ্রোতাদের দিকে মুখ করে গান আরম্ভ করতো। একই গান অনেক বার করে গাইতো। এক সারিতে গাইয়ে অপরের সঙ্গে জায়গা বদল করতো পুনরুক্তির সময়। উদ্দেশ্য ছিল দর্শকেরা যাতে গাইয়েদের সকলের মুখ দেখতে পায়। এর ব্যতিক্রম হলে তারা মনে করতো যাত্রার গান ঠিক ভাবে হচ্ছে না।

যাত্রায় সখীদের নাচই ছিল প্রধান। কিন্তু সম্প্রতি আগের মত নাচের বৈচিত্র্য নেই। আজকাল গ্রামাঞ্চলের যাত্রা দলের সখীর নাচ অনেক কমে এসেছে। তার একটি বড় কারণ হলো যাত্রা পদ্ধতির নৃত্য শিক্ষকের অভাব।

সখীদের নাচ আগেকার দিনের কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের নাচের অনুকরণেই গঠিত ছিল। নাচের কম্পোজিশন-এ ছিল পার্শী থিয়েটারের প্রভাব। সাজ পোশাক ছিল অবিকল সেই রকমের। বাংলার বিখ্যাত খেমটা নাচের অনুকরণে কোমর দোলানোর নানা ভঙ্গীই ছিল এ নৃত্যের প্রধান অঙ্গ। পার্শীরা কম্পোজিশনের দিকে বিলিতী নাচের অনুকরণ যে করতো তা দেখলেই বোঝা যেতো। তবে আগের দিনের থিয়েটারে যে বৈচিত্র্য দেখা যেতো, কম্পোজিশন-এ যাত্রাওয়ালারা ততটা পারেনি কোন দিনই। আসরের চারদিকের দর্শকদের জন্যে অনেকটা সহজ করে নিয়েছে তারা।

সং-এর নাচ যাত্রার একটি বিশেষ অঙ্গ। যদিও নাটকের বিষয়ের সঙ্গে তার যোগ বড় থাকে না, তবুও এ নাচ না থাকলে দর্শকরা খুশি হয় না। এই নাচ গানের সঙ্গেই হয়, তাই এই গানগুলিকে হাসির গানের পর্যায়ে অনায়াসে ফেলা যায়। যারা এ নাচ করে তারা সাধারণত হয় যাত্রার নাচে বিশেষ পারদর্শী। অধিকাংশ সময়ে "ডান্স মাস্টার" অর্থাৎ যাত্রার নৃত্যশিক্ষক এ নাচ দেখায়। এদের সঙ্গে সার্কাসের ক্লাউনদের ক্ষমতার তুলনা করা যেতে পারে। এই নাচের দ্বারা শ্রোতাদের যাত্রার গম্ভীর আবহাওয়া থেকে একটু হাল্‌কা আবহাওয়ায় নিয়ে যাওয়াই হল আসল উদ্দেশ্য। কখনো কখনো যাত্রায় এক ধরনের নাচকে 'বল্‌ডান্স' বলতেও শুনেছি। এই নাচটি সং-এর নাচ নয়। একবার একটি যুবক মাথায় পরপর চারটি মাটির কলসী রেখে, হাতে না ধরে, বাজনার তালে তালে নাচতে লাগলো। কখনো সেই অবস্থায় বসছে, উঠছে, নানাপ্রকার ভঙ্গী করছে হাত নেড়ে কিন্তু মাথার কোন নড়চড় নেই। কি কারণে একে তারা 'বল্‌ডান্স' বলে তার কোন যুক্তিপূর্ণ উত্তর পাইনি। এই নাচ উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের গ্রামাঞ্চলে আজও দেখা যায়। এ ছাড়া একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে পরস্পরের প্রতি গানের সুরে নানারূপ

আদিরসাত্মক বাক্য হেনে যে নাচ দেখায় তাকে যাত্রায় "ডুয়েট" বলে। এই নাচেও দর্শকরা খুব আমোদ পায়। পূর্বের ন্যায় এ নাচ এখন দেখা যায় কম। ইদানীং কলিকাতার আধুনিক নাচের প্রভাবে নতুন কয়েক প্রকার নাচ দেখা যাচ্ছে যাকে "ওরিয়েণ্টাল্ ডান্স" বলছে। এই পদ্ধতির সঙ্গে পূর্বের ধারার যোগ প্রায় নেই বল্লেই চলে।

এখন কথা হচ্ছে এই সব নাটকের অভিনয়কে আমরা 'যাত্রা' বলি কেন? যাত্রা কথার সাধারণ অর্থের সঙ্গে এর মিল কোথায়? এর উত্তর পেতে হলে এই শব্দটির বিষয়ে একটু আলোচনা দরকার।

বাংলা দেশে 'যাত্রা' শব্দের ইতিহাস নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বহুদিন থেকেই বহু রকমের আলোচনা হয়ে আসছে। তার থেকে তারা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, প্রাচীন ভারতে কোন দেবতার উৎসব উপলক্ষে উৎসব দিনে নৃত্যগীতপূর্ণ যে শোভাযাত্রা বের হত—তাকেই বলা হত "যাত্রা"। এই অর্থে যাত্রা শব্দের প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায় 'কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রে' অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব প্রায় ৪০০ বছর আগেকার এক বইয়ে। এর পরে এই উৎসব দিনের দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যে যে-সব নৃত্যাভিনয় হতো তারও নাম হলো যাত্রা। বৌদ্ধ যুগের সাহিত্যে, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি অনেকগুলি প্রাচীন বইয়ের বর্ণনায় দেখা যায় যে, সব রকমের উৎসব দিনের শোভাযাত্রায় নট নর্তক গায়ক বাদকেরা থাকতো। এরা যে কেবল রাস্তায় সহজ ভাবে হেঁটে চলে যেত, তা নয়, রীতিমত উচ্চাঙ্গের নৃত্যগীতের দ্বারা সেই শোভাযাত্রাকে মাতিয়ে রাখতো। উৎসব দিনের শোভাযাত্রায় এইরূপ একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন আজও দেখা যায় সিংহলের ক্যাণ্ডি শহরে। বুদ্ধের দন্ত উৎসবের দিনে হাতির পিঠে যখন দন্তটিকে শহর প্রদক্ষিণে বের করা হয় তখন তার পিছনে থাকে ক্যাণ্ডি প্রদেশের নৃত্য-গীতের বিভিন্ন দল। সমস্ত প্রদক্ষিণ পথ নৃত্য,

গীত ও বাজনায় তারা মুখর করে রাখে। এই ধরনের শোভা যাত্রায় নাচ গানে উচ্চশ্রেণীর নট নর্তকরা থাকতো বলেই ক্রমে ক্রমে উন্নত ধরনের নৃত্যাভিনয় ঐ দিনে সহজেই স্থান পেত। এই ভাবে দেবতার নামে উৎসব দিনে দেব-মাহাত্ম্য প্রচারমূলক নৃত্য-গীতাভিনয় 'যাত্রা' নামেই চলতে থাকে।

পণ্ডিতেরা বলেন, অভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দটির ব্যবহার বাংলা দেশ আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। শোনা যায় নেপালে নাকি নাটকের অভিনয় অর্থে 'যাত্রা' শব্দের ব্যবহার আছে। যদিও বাংলার প্রাচীন যাত্রার সঙ্গে এ যুগের যাত্রার আকাশ-পাতাল তফাত, তবুও আজও উৎসব দিনে যাত্রাদলের অভিনয় হয়। দুর্গাপূজার ঐ বিরাট উৎসব দিনে যাত্রা-অভিনয়ের কথা বাঙালীরা কে না জানে।

ইংরেজ-পূর্ব যুগে 'যাত্রা' ছিল প্রকৃত পক্ষে গীতাভিনয়। কতকটা পাঁচালী গানের মত। মূল গায়েন বা পাত্র থাকত তিনটি। একটি নারদমুনি থাকতো। তার কাজ ছিল মাঝে মাঝে হাস্যরসের অবতারণা করা। প্রথম যুগে যাত্রার বিষয় ছিল "কৃষ্ণলীলা"। তার মধ্যে বিশেষ করে "কালীয় দমন" পালা ছিল অতি প্রচলিত। এই কালীয় দমন বিষয়ের একটি বিবরণ এখানে তুলে দিই। তাতে আছে—

"একজন বৈষ্ণব এক পুষ্করিণীর উপর কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় করে। পুষ্করিণীটির নাম দেওয়া হইয়াছিল কালীয় হ্রদ।

"মধ্যস্থলে এক অজগর কালীয় সর্প, জল হইতে ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, সেই ফণার উপর কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া বেণু বাজাইতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে নয়ন ঢোলাইয়া নৃত্য করিতেছেন। নৃত্যপীড়নে কালীয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে, চারি পার্শ্বে তাহার স্ত্রীগণ জল হইতে অর্ধাঙ্গ তুলিয়া জোড় করে কৃষ্ণকে মিনতি করিতেছে—কখন তাহা কথায়, কখন বা গীতে। নিকটে মাচার উপরে মৃদঙ্গ, করতাল,

খরতাল বাজিতেছে, তথায় বসিয়া যাত্রাওয়ালারা 'দোয়ার্কি' করিতেছে।"

১৭৩২ খৃস্টাব্দের সময়ে শ্রীদাম ও সুবল নামে দুই ভাই কা দমন যাত্রা করত। এরা দুজন কৃষ্ণলীলা যাত্রাকে উন্নত ও পুষ্ট করে। "এইজন্য আদি কৃষ্ট-যাত্রা সকলের প্রস্তাবকদ্বয়কে অর্থাৎ জুড়িদিগকে অনেক কাল ধরিয়া ছিদাম ও সুবল নামে ডাকা হইত।"

"যাত্রার মৌলিক আকার সংগীত মাত্র ছিল। প্রথমত মঙ্গল সংগীত অর্থাৎ উপাস্য দেবতার স্তুতিগান দ্বারা যাত্রাভিনয় আরম্ভ হইত, পরে অধিকারী বা অভিনয় রচয়িতা অথবা অভিনয় সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিদ্বয় অর্থাৎ জুড়ি দ্বারা অভিনয় ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্তের পূর্বাভাস বা প্রস্তাবনা সংগীত দ্বারা ব্যক্ত করা হইত। লব কুশ ইহার আদি প্রস্তাবক এই আখ্যা প্রদত্ত হইত। সকল কৃষ্ণযাত্রার প্রথমে একজন ব্যাসদেব সাজিয়া প্রস্তাবনা করে। সাবেক যাত্রাওয়ালারা কথাবার্তা সুরে কহিত এবং সুরের নিমিত্ত কথা একটু টানিয়া কহিত। তাহাদের লোকবিশেষের স্বর স্বতন্ত্র ছিল। ব্যাসদেবের স্বর পিতল পাত্রের ন্যায় বাজিত। কণ্ঠস্বর সেরূপ না হইলে কেহ ব্যাসদেব সাজিতে পাইত না। বিরহিনীদের আর এক প্রকার সুর ছিল।"

"বসন্তে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, শরতে রাসযাত্রা, এবং বর্ষায় রথযাত্রা, সম্বৎসরের মধ্যে এই তিন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের তৎকালিক লীলা-ঘটিত বিষয় সকল ব্যতীত অন্য কোন বিষয় পুরাকালে যাত্রাকারে অভিনীত হইত না এবং উল্লিখিত তিন সময় ব্যতীত তৎকালে যাত্রাভিনয় হইত না। পরে কৃষ্ণলীলাঘটিত সমস্ত বিষয়, অর্থাৎ মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন, প্রভাস মিলন, মাথুর, জন্মাষ্টমী, কংসবধ, প্রহ্লাদ-চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র প্রভৃতি অভিনয় সকল সময়ে এবং সকল প্রকার পর্বে ও উৎসবে বার মাসই অভিনীত হইতে লাগিল।" বৈষ্ণবদের দেখাদেখি শৈব ও শাক্তরাও শিব ও শক্তি বিষয়ক যাত্রার চলন করেন।

সেকালের কৃষ্ণযাত্রায় শ্রীকৃষ্ণ, রাধা, রাখাল বালক, গোপী, দূতী সকলেই সুরে কথা বলিত। যাত্রায় একার গান, প্রশ্ন উত্তরের ছলে দু'জনের গান, তিন জনের ও বহু জনের কোরাস গানও ছিল। যাত্রার দলে আগে ১০ থেকে ১৪টি খোল এক সঙ্গে বাজতো। কারণ যাত্রার গান ছিল কীর্তনের ঢং-এর ও সুরের।

যাত্রায় জয়দেবের পদাবলী আবৃত্তি, ব্যাখ্যা ও গান হত, মাঝে মাঝে কথোপকথন থাকতো। প্রাচীন মহাজন পদাবলীও ঐ পদ্ধতিতে যাত্রায় স্থান পেয়েছে।

পণ্ডিতদের মত যে, চৈতন্যদেবের সময় থেকে প্রায় ১৮৪২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কালীয় দমন বা ঐ নামের প্রাচীন পদ্ধতির যাত্রা বাংলা দেশে চালু ছিল।

১৮২০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে প্রাচীন পদ্ধতির যাত্রার পরিবর্তন শুরু হয়। এই যাত্রাকে কলিকাতাবাসীরা নাম দিয়েছিল "শখের যাত্রা" বা নতুন যাত্রা। নানাপ্রকার রাগরাগিনী যুক্ত গীত, বাদ্য, নৃত্য ও কথোপকথন ছিল এর প্রাণ। যাত্রার এই পরিবর্তনের কারণ ছিল ইংরেজি থিয়েটারের প্রভাব। এই পরিবর্তিত প্রথম যুগের যে কয়টি যাত্রার নাম পাওয়া গেছে, সে কটি হলো "কলিরাজার যাত্রা", "নল-দময়ন্তী যাত্রা" ও "বিদ্যাসুন্দর যাত্রা"। পরে বিদ্যা-সুন্দর যাত্রা দেশে বিখ্যাত হয়ে ওঠে গোপাল উড়ে নামক একজন যাত্রাওয়ালার চেষ্টায়। এ সময়ের যাত্রায় মালিনীর নাচ বিশেষ করে দেখানো হতো। তাছাড়া "কালুয়া ভুলুয়া", "মেথর মেথরাণী", "ঘেসেড়া ঘেসেড়ানী", "নাপিত নাপতানী"-দের নাচ ও গানের মধ্যে ছিল প্রবলভাবে হাস্যরস বিতরণের চেষ্টা। উনবিংশ শতকের মাঝখান থেকে এই ধরনের নাচ ও গান অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হয়ে ওঠে। নতুন যাত্রার যুগেই প্রথম ঢোল, তবলা বাঁয়ার সঙ্গত ও টপ্পার সুরের গান প্রবেশ করে।

এই "শখের যাত্রা" বা যাকে বলা হত নতুন যাত্রা, তারও পরিবর্তন ঘটল উনবিংশ শতকের শেষার্ধে, ১৮৭৬ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। তখন কলিকাতা অঞ্চলে পেশাদারী থিয়েটারের খুব প্রাধান্য। তারই দেখাদেখি যাত্রায় দেখা দিল থিয়েটারকে হুবহু অনুকরণ করার দিকে ঝোঁক। আরম্ভে যাত্রার যে বর্ণনা দিয়েছি তার সূত্রপাত এই সময় থেকে।

উনবিংশ শতকের আগের যাত্রাকে বলা চলে সম্পূর্ণরূপে গীত-নাটক। কীর্তন ও পাঁচালীর প্রভাবে তা রচিত ও গীত হতো। এ যুগের মত বহু লোক সমন্বয়ে তা অভিনীত হোতো না। গাইবার উপযোগী লোক পেলেই তার কাজ চলে যেতো। শখের যাত্রায় প্রথমে অনেক লোকের প্রয়োজন হল। থিয়েটারের যুগে যাত্রায় গান রচনা হতো হিন্দি, ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পার ঢং-এ। থিয়েটারী প্রথায় বহু যন্ত্র সমন্বয়ে ঐক্যতান বাজনা যাত্রায় দেখা দিল ঐ যুগে। এখন থেকে যাত্রায় কথা হল প্রধান।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের খ্যাতনামা যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে যাঁদের নাম আজ পর্যন্ত জানা গেছে তাঁরা হলেন,—

(১) শিশুরাম (২) শ্রীদাম (৩) সুবল (৪) পরমানন্দ (৫) প্রেমচাঁদ (৬) আনন্দ (৭) জয়চাঁদ (৮) লোচন (৯) বদনচন্দ্র (১০) নীলকমল (১১) গোবিন্দ (১২) রামচন্দ্র (১৩) গোপাল উড়ে (১৪) নারায়ণ দাস (১৫) গুগ্‌গ ঘড়িয়াল (১৬) বৈকুণ্ঠ (১৭) লোকা ধোপা (১৮) বগ্‌নেড়ে (১৯) ব্রজ রায় (২০) মতি রায় (২১) রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী (২২) নবীন ডাক্তার (২৩) অভয় দাস (২৪) নীলকণ্ঠ মজুমদার (২৫) বৌ মাস্টার (২৬) কৃষ্ণকমল গোস্বামী (২৭) রাধাকৃষ্ণ (২৮) কালী হালদার (২৯) লোকনাথ (৩০) হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (৩১) মতিলাল ঘোষ (৩২) নীলকণ্ঠ (৩৩) মতিলাল রায় (৩৪) ধর্মদাস (৩৫) ঠাকুরদাস মুখার্জী (৩৬) রামচাঁদ মুখার্জী

(৩৭) অভয় দাস (৩৮) নিমাই দাস (৩৯) নিতাই দাস (৪০) মদনমোহন মাস্টার।

যাত্রার বিষয়বস্তুর পরিবর্তন কি ভাবে ঘটে এবারে তা দেখা যাক। প্রথম দিকে যাত্রার অভিনয় হতো ধর্মবিষয়ে অর্থাৎ কালীয় দমন নিয়ে। তারপর এলো কৃষ্ণ বিষয়ের নানা গল্প। রামায়ণ, মহাভারত ও নানাপ্রকার পৌরাণিক বিষয়ের যাত্রা দেখা দিল পরে। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ের যাত্রা পেলাম। বিংশ শতকের আরম্ভে দেখা দিল রাজনৈতিক বিষয়ের যাত্রা। এই যাত্রার সঙ্গে স্বদেশী যুগের মুকুন্দ দাসের নাম বিশেষ ভাবে জড়িত হয়ে আছে।

কিছুকাল পূর্বে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের রচনায় একপ্রকার যাত্রার কথা দেশবাসী জানতে পেরেছে। এর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কাল্পনিক বিষয় নিয়ে এগুলি রচিত। অসংলগ্ন ঘটনার সমাবেশে এ একরকমের হাস্যরসাত্মক যাত্রা। কতকটা সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল' জাতীয়। সেইরূপ নির্মল হাস্যরস তিনি যাত্রার সাহায্যে শিক্ষিত শ্রোতাদের কাছে বিতরণ করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ যে প্রথম পথ দেখালেন, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যাত্রার প্রভাব খুব লক্ষ্য করি প্রথম শারদোৎসব, ফাল্গুনী ইত্যাদি নাটকের মধ্যে। শেষ জীবনে রচিত "তাসের দেশ" হল সম্পূর্ণরূপে এ যুগের যাত্রা-পদ্ধতির গীত-নাটক। এই সব নাটকে গান আছে। গানগুলি নাটকের কথা হিসেবে বসানো। যেখানে কথায় বলা শেষ হচ্ছে না, তাকে যেন গানে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই নাটকগুলিতে বিষয়ের নতুনত্বও লক্ষ্যণীয়। লিরিক-ধর্মী নাটক যাত্রার আঙ্গিকে রচিত। এগুলি ধর্মবিষয়ক নয়, ঐতিহাসিক সামাজিক নয়, বা হাস্যরসেরও নাটক

নয়। শুকদেবের নাটকে অন্যান্য যাত্রার মত কনসার্টের ব্যবহার নেই।

যাই হোক, আসলে আমরা এ যুগে যাত্রা নামে যে সব নাটকের অভিনয় দেখি তা হলো কলিকাতার থিয়েটারের একটি গ্রামীণ সংস্করণ; অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষার্ধে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের জন্যে যে ভাবে নাটক লেখা হতো, যে ভাবে রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয় হতো, যে ভাবে প্রতি অঙ্কের আরম্ভে যন্ত্রসংগীত ঐক্যতান বাজতো, যে ভাবে অভিনেতাদের সাজানো হতো, যে ভাবে সখীরা নাচতো বা যে ভাবে হাসির গান ও নাচের দ্বারা লোকরঞ্জন করার চেষ্টা হতো, তার সবই যাত্রায় পাওয়া যায়। কেবল পাওয়া যায় না থিয়েটার গৃহ, রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা ও তার আলোক-সম্পাতের বিচিত্র ব্যবস্থা। এ কটি বাদে আর কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না।

দক্ষিণ ভারতের ছায়ানাট্য

ছায়ানাটক বলতে আমরা যাভা ও বলিদ্বীপে প্রচলিত নাটকের কথাই বিশেষ করে শুনে থাকি। এর কারণ, হল ঐ দুই দেশে ধনী দরিদ্র সকলের মধ্যেই ছায়ানাটকের চর্চা আছে, আজও তারা তা দেখে আনন্দ উপভোগ করে। এছাড়া ঐ ছায়ানাটক নিয়ে সে দেশের ও বিদেশের পণ্ডিতেরা এত বিস্তারিত আলোচনা ও অনুশীলন করেছেন যে, তাদের সেই বই পড়েই আমরা সব খবর পেতে পারি।

ভারতের ছায়ানাটক নিয়ে এ ধরনের আলোচনা ও অনুশীলন আজ পর্যন্ত হয়নি। ইদানীং সবেমাত্র জানা যাচ্ছে যে, ভারতের কোন কোন অঞ্চলে ঐরূপ নাটকের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এ যুগে সেইসব অঞ্চলের শিক্ষিতদের মধ্যেও তার আদর নেই। প্রাচীন নাট্যকলার দলে এরও যে একদিন বিশেষ স্থান ছিল, সেকথা আজ সকলেই ভুলেছে। এখন একদল দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে এই শিল্প প্রচলিত বলে শহরের শিক্ষিতরা এর শিল্পগত মর্যাদা পর্যন্ত স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করে।

ভারতের ছায়ানাটক নিয়ে পণ্ডিতমহলে কোন আলোচনা না হওয়ার দরুন ভারতের বাইরে, বিশেষ করে যাভা ও বলি অঞ্চলে, পণ্ডিতদের ধারণা, সে দেশের ছায়ানাটকের মধ্যে ভারতের কোন প্রভাব নেই। সেদেশে থাকাকালীন এ ধরনের কথা অনেকের মুখেই আমি শুনেছিলাম।

উত্তর ভারতে কোথাও প্রাচীন প্রথার ছায়ানাটক আছে বলে শুনিনি। কিন্তু দক্ষিণ'ভারতের অন্ধ্র, কানাড়া, তামিল ও মালাবার প্রদেশের বহু গ্রামে এই নাটক সুপরিচিত। এখনো তার অভিনয়

দেখানো হয়। গ্রামবাসীরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ঐ ছায়ানাটক আজও দেখছে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে ছায়ানাটক ছিল তার নাকি প্রাচীন সাহিত্যে কোথাও কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ কোথাও নেই। অশোক শাস্ত্রী মহাশয় বছর কয়েক আগে এ বিষয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছিলেন এক প্রবন্ধে; কিন্তু পরিষ্কার করে কিছুই বলতে পারেননি। তিনি বলেন, মহর্ষি পাণিনি রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ সূত্রের উপর পতঞ্জলি যে মহাভাষ লিখেছিলেন, তার এক জায়গায় তিন শ্রেণীর শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। যেমন 'শোভনিক', 'গ্রন্থিক' ও 'চিত্রকর'। দেশ-বিদেশের কোন কোন পণ্ডিত 'শৌভিক' শব্দের অর্থ ক'রে বলছেন, 'শৌভিক' হল নাট্যাচার্য। আবার কেউ বলছেন মূকাভিনেতা, কেউ বলছেন, মূকাভিনেতাদের ক্রিয়াকলাপ যারা দর্শকদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন তাঁরা। অন্য পণ্ডিতরা বলেন, যারা ছায়াচিত্র প্রদর্শন ও তার ব্যাখ্যা করে তারাই 'শৌভিক'। শাস্ত্রী মহাশয় আরো বলেন—"মধ্যযুগে আসিলে দেখা যায় যে, 'ছায়ানাট্য' নামে একশ্রেণীর সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য তখনকার দিনে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সংস্কৃত 'ছায়ানাট্য' ও ইংরাজী 'Shadowplay' এক জাতীয় বস্তু নহে। তাঁহার মতে একখানি বড় দৃশ্যকাব্যের অঙ্কদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিরামকালে যে ক্ষুদ্র সংস্কৃত নাট্যের অভিনয় হইত, তাহারই নাম 'ছায়ানাট্য' (Entracts)।

"মহাভারতের শান্তিপর্বে 'রঙ্গাবতরণ' ও 'রূপোপজীবন' এই দুইটি শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের (১৭শ শতাব্দী) মতে তার অর্থ হইল 'ছায়া সম্পাতের সাহায্যে অভিনয়'। তাঁহার সময়ে দাক্ষিণাত্যে এইপ্রকার অভিনয়ের পারিভাষিক নাম ছিল 'জলমণ্ডপিকা'। একখানি পাতলা কাপড় পর্দার মত করিয়া খাটাইয়া

উহার উপর চর্মময় পুত্তলিকার ছায়া ফেলিয়া রাজা, অমাত্য প্রভৃতি নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির কার্যকলাপ প্রদর্শনের নাম ছিল 'রূপোপজীবন'। নীলকণ্ঠ-কৃত 'রূপোপজীবন' শব্দের ব্যাখ্যা অনেকেই সমীচীন বোধ করেন না।

"অন্তত মধ্যযুগে ভারতে কোন-না-কোনরূপ ছায়া নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল। আর এখন হইতে অন্তত তিন শত বৎসর পূর্বে ভারতে ছায়া সম্পাতের দ্বারা অভিনয় প্রথা (জলমণ্ডপিকা) খুবই চলিত—ইহাতেও সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।"

প্রাচীন ভারতের ছায়ানাটকের আলোচনার চেষ্টা ত্যাগ করে বর্তমানে দক্ষিণ ভারতের গ্রামাঞ্চলে ছায়ানাটক কিভাবে দেখানো হয়, তারই একটু বর্ণনা করবো।

দক্ষিণ ভারতের এই চার অঞ্চলের ছায়ানাটক একই দলের হলেও অন্ধ্র ও কানাড়ায় প্রচলিত ছায়ানাটক দেখে মনে হবে যেন একটি আর একটিকে হুবহু অনুকরণ করেছে। ওদিকে তামিলদের প্রভাব মালাবারের ছায়ানাটকে যে পড়েছিল তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে।

মালাবারের ছায়ানাটককে বলে "পারকুট্টু"। কোচিনের গ্রামাঞ্চলের "ভগবতী" ও "ভদ্রকালী"র মন্দিরে এ নাটকের অভিনয় প্রচলিত। বসন্তকাল হল অভিনয়ের উপযুক্ত সময়। তামিলদেশের বিখ্যাত কবি কাম্বারের রচিত রামায়ণের ঘটনা নিয়েই মালাবারের ছায়ানাটক দেখান হয়। মালাবারে বর্তমানে ছায়ানাটক যেভাবে গঠিত এর প্রচারক হলেন "রামানারুল" ও "চতুরা" নামে দুই ব্যক্তি। এঁরা তামিলদেশ থেকে কাম্বারকৃত রামায়ণসহ এই ছায়ানাটক এদেশে আনেন। সেই কারণে মালাবারে ছায়ানাটকের আরম্ভে সব সময় এই দুই ব্যক্তির নাম স্মরণ করা হয়। তামিল ভাষায় 'কাম্বার' কৃত রামায়ণ সেই কারণে আজও মালাবারের ছায়ানাটকের শিল্পীরা গেয়ে

থাকে। জনসাধারণ তা অনায়াসে বুঝতে পারে বলেই তার পরিবর্তন করা হয়নি। অন্যান্য গ্রাম্যপ্রচলিত নাটকের মত এই ছায়ানাটকও সমস্ত রাত ধরে দেখানো হয়। যারা দেখায় তাদের ওরা বলে "পুলাব্বার" অর্থাৎ গীতকার।

ছায়ানাটকের পুতুলগুলি তৈরি হয় পাতলা হরিণের চামড়ায়। গরু বা মোষের চামড়া ব্যবহার নিষিদ্ধ। পুতুলের সাজপোশাক অলঙ্কার রঙ্গের দ্বারা পুতুলের গায়েই আঁকা হয়। এছাড়া ছোট ছোট ফুটোতে এমনভাবে পুতুলের উপর নকশা কাটা হয় যে, যখন আলোর সাহায্যে পরদার উপর সেগুলির ছায়া পড়ে তখন ফুটোগুলিকে দেখতে মনে হবে তুলির টানের মত। পুতুলগুলি আকারে নানা-রকমের হয়। কিন্তু সে অঞ্চলে আড়াই ফুটের চেয়ে বড় পুতুলের ব্যবহার নেই। পুতুলগুলি বাঁশের বা কাঠের পাতলা ডাণ্ডার সঙ্গে আটকানো এবং প্রত্যেক পুতুলের পায়ের দিকে বিঘৎ খানিকের মত ডাণ্ডাটি বেরিয়ে থাকে। সেইটি ধরেই পুতুলের খেলোয়াড়রা পর্দায় পুতুলগুলিকে খেলায়। পুতুলগুলি নানা রঙের দ্বারা চিত্রিত হলেও তার রঙ লাগাবার একটি বিশেষ নিয়ম আছে। যেমন রামের গায়ের রঙ হবে ঘন নীল বা সীতার গায়ের রঙ হবে চাঁপা ফুলের মত।

ছায়ানাটকের জন্যে স্বতন্ত্র একটি "মঞ্চ" থাকে। এটিকে তাদের ভাষায় বলে "কুট্টিমেড্ম্"। যেখানে 'ভগবতী' ও 'ভদ্রকালী' মন্দিরে ছায়ানাটকের অভিনয় প্রচলিত, সেখানেই মন্দির-সংলগ্ন মাঠে এ ধরনের একটি রঙ্গমঞ্চ থাকবে। বেশির ভাগ মঞ্চকেই একদিক খোলা চালাঘর বলা চলে। চার-চালা টালির ছাদ এবং সে অঞ্চলের লাল শক্ত মাটির দেয়াল দেওয়া ঘরও অনেক দেখা যায়। নিয়ম হল মঞ্চের মুখ, অর্থাৎ যেদিকে সাদা পরদা খাটানো হয়, তা সব সময়েই দক্ষিণ-মুখী হবে। দর্শকেরা উন্মুক্ত আকাশের তলে মাটিতে বসে। মঞ্চটির তিনদিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দক্ষিণ দিকে উপর থেকে পাঁচ ফুট

চওড়া ও আঠার ফুট লম্বা সাদা চাদর টান করে বাঁধা থাকে। মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু একটি দেয়াল তোলা হয় চাদরটি যে পর্যন্ত ঝুলে আছে, সেই পর্যন্ত। মঞ্চের সামনে যেদিকে চাদরটি বাঁধা ঠিক তার মাঝামাঝি নিচ থেকে চালা পর্যন্ত একটি সরু কাঠের থাম দেখা যায়। দেখে মনে হয় উপরের চালটিকে ধরে রাখবার জন্যেই থামটির প্রয়োজন। কিন্তু থামটি আরো একটি কাজ করে। তা হল পরদাটিকে দুই ভাগে ভাগ করার জন্যেই ঐভাবে তাকে রাখা হয়েছে। পরদার ডানদিকে ভিতরে কাঁটার সাহায্যে আটকানো থাকে রামায়ণের গল্পের ভাল পক্ষ। যেমন রাম লক্ষ্মণ সীতা প্রভৃতি, আর বাঁদিকের চাদরে থাকবে রাবণ ও রাক্ষসগণ।

ছায়ানাটকের আরম্ভের আগে নিকটবর্তী মন্দিরে পূজা, দীপারাধনা ও গণপতি পূজা করার নিয়ম। পরে কথক বা গায়ক দলবলসহ এক শোভাযাত্রাযোগে ঢাক ঘণ্টা বাজিয়ে মন্দির থেকে বের হবে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে, এবং একটি বড় পেটিকায় চামড়ার পুতুল ও রামায়ণের পুঁথিগুলি মাথায় নিয়ে। মন্দিরের ঐ প্রদীপের আলোতেই রঙ্গমঞ্চে প্রদীপগুলি জ্বালাবার নিয়ম। পুতুলের খেলোয়াড়রা মন্দির থেকে বেরিয়ে সোজা মঞ্চে প্রবেশ করে না। তিনবার মঞ্চ-গৃহটিকে প্রদক্ষিণ করে। প্রদীপটিকে বাইরে রেখে অন্ধকারে মঞ্চগৃহে প্রবেশ করার নিয়ম। অন্ধকারেই কিছুক্ষণ ভগবানের বন্দনা গান ও বাজনা বাজাবার পর মন্দির থেকে আনা বাতির আলোতে এক এক করে প্রায় একচল্লিশটি প্রদীপকে জ্বালানো হয়। প্রদীপগুলি মাটির কিম্বা নারকোলের মালায় তৈরি। তাতেই সলতে ও তেল দিয়ে মোটা চেরা বাঁশের উপরে সার করে সাজিয়ে দেয়। গায়ক ও কথকদের মাথার উপরে এমন জায়গায় ঝোলানো থাকে যে, তাদের ছায়া চাদরে পড়তে পারে না। আগেই বলেছি, পর্দার নিচটি চার-পাঁচ ফুট দেয়ালে আড়াল করা আছে বলে পুতুল-নাচিয়েদের বাইরে থেকে দেখা যায়

না। এরা যে দুটি হাত ব্যবহার করে তারই ছায়া পর্দায় প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

ছায়ানাটকের আরম্ভেই বিশেষ দুটি পুতুলকে পর্দার ছায়ায় দেখানর নিয়ম। এরা হল পুতুলের ব্রাহ্মণ। এরা ছায়ানাটকে প্রাচীন ভারতীয় নাটকের সূত্রধারের মত কাজ করে। প্রথমে এসেই গণেশের বন্দনা গান করবে, অভিনয়ের বিঘ্ননাশের জন্যে। তার পরে বারে বারে এসে সমগ্র নাটকটির খেই ধরিয়ে দেওয়া হল এদের প্রধান কাজ। আর আরম্ভে আগের দিনে কি নিয়ে অভিনয় হয়েছিল, সেকথাও তারা বলে দেয়।

ছায়ানাটকের কথকরা গায়কদের, যাকে ওরা বলে 'পুলাব্বার', রামায়ণ মহাভারত ও নানাবিধ শাস্ত্র বিষয়ে সুপণ্ডিত হতে হয়। ঐসব প্রাচীন সাহিত্যের যাবতীয় বিষয় তাদের নখদর্পণে। তামিল ভাষায় রামায়ণ গান করলেও নানারূপ কথাবার্তায় ঠাট্টা-তামাশায় এরা যে রকম উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তাতে এদের ক্ষমতার তারিফ না করে পারা যায় না। নিজেরাই নানারূপ নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা ক'রে তামিল রামায়ণকে আরো মধুর করে তোলে। নিয়ম হচ্ছে পর্দার পুতুলগুলির চরিত্রানুযায়ী পিছন থেকে কথক বা গায়কেরা সেই স্বরে ও ঢং-এর কথা বলবে। এইভাবে পুরো রামায়ণের গল্প শেষ করতে অনেক রাত্রির দরকার হয়। যে রাত্রে রাবণ-বধের পালা শেষ হবে, তার পরের রাত্রিতে কোন অভিনয় হয় না। দিনের বেলা গোবরজল দিয়ে মঞ্চকে লেপতে হবে, মন্দিরের মন্ত্রপূত জল ছেটাতে হবে ও সাদা পর্দাটি জলে ধুতে হবে। পরের দিন মন্দিরে থাকে ভোজের আয়োজন। রাত্রে রামের রাজ্যাভিষেক পালা। এই দৃশ্য শেষ হলে পরদিন রামসীতার পুতুলকে মালা পরিয়ে শোভাযাত্রা বের করে।

ছায়ানাটকের পুতুলগুলির চালচলনে খুব একটা বৈশিষ্ট্য দেখি না। সহজভাবেই নড়েচড়ে বেড়ায়। কেবল যুদ্ধের দৃশ্যে নড়নচড়ন-বৈচিত্র্য

ও কলাকুশলতার পরিচয় ফুটে ওঠে। তবুও গায়কের গান, কথাবার্তা, ছায়াদৃশ্য ও বাজনার ছন্দে মিশে দর্শকদের মনের উপরে বেশ একটা মধুর ছাপ রেখে যায় এবং কল্পনায় মনে ছবি আঁকবার যে অবসর দেয়, তারও মূল্য কম নয়।

মালাবারের মত ছায়ানাটক বংশগত ব্যবসা হিসেবে চলে আসছে অন্ধ্রতেও। তবে অন্ধ্রতে মালাবারের মত কোন বিশেষ মন্দিরের সঙ্গে তা যুক্ত নয়। বায়না নিয়ে পুরুষ মেয়ে শিশু সমেত এইসব পরিবার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায় অভিনয় দেখিয়ে। এরা নিজেরাই অভিনয়ের আগে বাঁশের খুঁটি দিয়ে রঙ্গমঞ্চ রচনা করে নেয়। ঘরটির তিনদিক মোটা কালো কাপড়ে ঢাকা থাকে। সামনের দিকে মাটি থেকে খানিকটা উঁচুতে সাদা একটি পরদা খাটিয়ে দেয়। সাদা চাদরের নিচটাও ঢাকা থাকে খড় বা বেড়ার মত কিছু দিয়ে। তাতে সামনে থেকে ভিতরের মানুষকে দেখা যায় না। ছাউনী তালপাতার। সাদা চাদরের পাঁচ ফুট তফাতে ঘরটির ভিতর দিকে মাটির প্রদীপগুলি সারি করে ঝোলানো। এরাও দুই হাতে পুতুলগুলি নাচায় বা গানের কথার সঙ্গে মিলিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে নাড়ায়। মালাবারের চামড়ার চেয়ে এই চামড়াগুলি আরো পাতলা। চামড়ার এপিঠ থেকে ওপিঠ স্পষ্ট দেখা যায় বলে, চামড়ায় আঁকা যাবতীয় রঙীন নক্সাগুলি চাদরের উপর সুন্দর ফুটে ওঠে। সব অঞ্চলের পুতুলের হাতগুলি আলাদা আটকানো থাকে বলে সুতোর সাহায্যে খেলোয়াড়রা অভিনয়ের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে নাড়াতে পারে। শরীরের আর কোন অংশ নড়ে না। অন্ধ্রের পুতুলগুলি আকারে এক ফুট থেকে সাত ফুট পর্যন্ত বড় হয়। এই আকার নাটকের চরিত্রের মর্যাদানুসারে নাকি দেওয়া হয়। প্রথম থেকেই পুতুলগুলি দুপাশে বিভক্ত হয়ে পর্দার গায়ে আটকানো থাকে। এরাও আরম্ভে গণেশের বন্দনা করে। প্রত্যেক বড় দৃশ্যের মাঝখানে হাল্কা ধরনের

রস সৃষ্টির জন্যে আলাদা পুতুলের নাচ দেখানো হয়। এই নাচগুলি উপভোগ করার মত। তারপরে আসে বিদূষক। এর অভিনয় ও ভাঁড়ামি দর্শকদের মনে খুবই আনন্দ দেয়। অন্ধ্রদেশে ছায়ানাটকের অভিনয় দেখা দেশের পক্ষে মঙ্গল বলে গ্রামবাসীরা মনে করে। তাদের ধারণা এর দ্বারা দেশে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অন্ধ্রদেশে কেবল রামায়ণ নয়, মহাভারতের গল্পও অভিনীত হয়। এরা নিজেদের ভাষাতেই গান ও কথাবার্তা বলে। অন্ধ্রদেশে ছায়ানাটকের গান করে মেয়েরা। পুতুলের মেয়ে-চরিত্রের কথাগুলি তারাই বলে। পুরুষেরা বলে পুরুষ পুতুলের সঙ্গে। অন্ধ্ররা ছায়ানাটককে বলে 'বোম্মলাত'।

দক্ষিণ কানাড়ায় বা তাঞ্জোরের গ্রামাঞ্চলে এই ছায়ানাটক-শিল্পীর বংশ আজও দেখা যায়। সেসব অঞ্চলে ছায়ানাটক তারা দেখিয়েও থাকে। কিন্তু এই অভিনয়কলার প্রতি কারু নজর নেই বলে সবেরই অবস্থা আজ ধ্বংসের পথে। এদের পিতা, প্রপিতামহদের আমলে ছায়ানাটকের যে আদর ছিল আজ আর তা নেই। এই পুতুলগুলি রচনার দ্বারা তখনকার গ্রামবাসীরা যে শিল্পবোধের পরিচয় দিত তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আজ তাদের সে রুচিটি প্রায় নষ্ট হয়ে এসেছে। আগের মত সর্বাঙ্গসুন্দর পুতুল তৈরি করার ক্ষমতাও তাদের আর নেই। দেশকে সত্যিই ভাল করে চিনতে হলে দেশের বিকাশের অংশবিশেষ এদেরও ভাল করে জানতে হবে, এদের সমাদরের সঙ্গে আমাদের মধ্যে টেনে নিতে হবে এবং এই কলাকেও সমাদর করতে হবে।

নৃত্যবিষয়ে যাবতীয় চিন্তা শহরবাসীরা নিজেদের এই ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যেই করে থাকে। আমরা যখন বলি, এ যুগে আমাদের দেশে নাচের অবনতি হয়েছে তখন আমরা অত্যন্ত ভুল করি। সে অবনতির কথা সমগ্রভাবে ভারতীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে কখনই প্রযোজ্য হতে পারে না। মুসলমানযুগের সভ্যতার উপরে অনেকেই দোষ দিয়ে বলেন যে, তার প্রভাবে ভারতীয় নৃত্য অনেকখানি ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু সমগ্র ভারত নিয়ে বিচার করলে দেখা যায় তা মোটেই সত্য নয়। তখনও উচ্চ ও সাধারণ নানাশ্রেণীর নাচের চর্চা ভারতের নানা অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে বিশেষভাবে হত। এ যুগেও ভারতের যে সব অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব কম সেখানে ভারতীয় নৃত্যের আন্দোলন খুবই জাগ্রত। সেখানে ত আমরা কোনরূপ অবনতির পরিচয় পাই না। যেটুকু রুচিভ্রষ্টতার লক্ষণ কোথাও কোথাও প্রকাশ পায়, ভাল করে বিচার করলে দেখা যাবে যে, তার মূল কারণ হল শহরের ভ্রষ্টরুচির প্রভাব। গ্রামের বহু রকমের নাচে উচ্চরুচির নিদর্শনে অনেককেই মুগ্ধ করে। আমরা যদি ধীরভাবে চিন্তা করি, তাহ'লে দেখব এতদিন আমরা শহরবাসী শিক্ষিতেরা নৃত্যকলা বিষয়ে ভালমন্দ যেসব কথা বলেছি তা খুব ভেবে চিন্তে বলিনি। রুচিহীন বলেই নাচকে আমরা এতদিন গ্রহণ করিনি বললে অন্যায় বলা হবে, আসলে ইংরেজ যুগের শিক্ষাই আমাদের নাচকে অবহেলা করতে শিখিয়েছে।

বেশ কয়েক বছর আগে বাংলা দেশের এক সংবাদপত্রে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিকল্পিত, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নৃত্যশিক্ষার প্রচলন বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, "ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাদপ্তর ভারতের স্কুল ও কলেজ সমূহের বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচলনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি লোকনৃত্য মনোনয়ন করিবার জন্য ভারতের সর্ববিধ লোক-

নৃত্য পরীক্ষা করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। এবিষয়ে সকল রাজ্য-গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা চাওয়া হইতেছে।

সকল রাজ্য হইতে যথেষ্ট তথ্যাবলী সংগ্রহের পরে বিভিন্ন ভারতীয় লোকনৃত্য শিক্ষা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করিতে পারেন।”

সংবাদটি পড়ে প্রথমেই প্রশ্ন জেগেছে, শিক্ষাবিভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে নাচের যে ব্যবস্থা করতে চান তা কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে? মনে হয় যাদের মধ্যে নিজস্ব নাচ বলে কিছু নেই, যারা আজ একসঙ্গে গ্রামসমাজের মত আনন্দে নাচতে জানে না, সেই নগরবাসী নরনারীদের জন্যে। নৃত্যবিষয়ে শিক্ষা বিভাগের এই চিন্তার ভিতর দিয়ে তাদের কথাই যেন প্রকাশ পাচ্ছে। তাদের মধ্যে নিজস্ব কোন ধারার নাচ নেই বলেই এত বাছাবাছির কথা উঠছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, যাদের মধ্যে নিজস্ব নাচের চর্চা রয়েছে, যে গ্রামবাসীরা যুগযুগ ধরে শহরবাসী শিক্ষিতদের অবহেলাকে লক্ষ্য না করে, নিজেদের মধ্যে নাচকে সজীব রেখেছে, তাদের মধ্যেও কী কার্যকরী হবে? ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা সম্প্রদায়ের গ্রামবাসীরা যে বহু রকমের নৃত্যের অধিকারী, সরকারী শিক্ষা বিভাগের পরিকল্পিত এই ইচ্ছা কার্যকরী হলে সেই সব নাচের কি হবে? নির্বাচিত নাচ গ্রহণ করে অন্য সব নাচ কি তারা ত্যাগ করবে? শিক্ষা বিভাগ বেছে বেছে গোটাকয়েক নাচকে যদি ভারতের সব বিদ্যালয়ে আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় বলে নির্দেশ দেন, তবে বিদ্যালয়ের প্রভাবে ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সকল গ্রামবাসী তাদের প্রচলিত নাচগুলিকে অবশ্যই অবহেলা করবে। তা করবারও কারণ আছে। ভারতের নানা অঞ্চলে নানাস্তরের হিন্দু সমাজের ধর্ম-উৎসবগুলিই ছিল নানারূপ শিল্পকলার বিকাশের উৎসব। সরকারী শিক্ষা পরিকল্পনায় ধর্ম উৎসব-

গুলিকে বিদ্যালয়ে স্থান না দেওয়ায়, বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বর্ধিত প্রায় প্রত্যেক হিন্দুই ধর্ম উৎসবের প্রতি অমনোযোগী হবে, এমন কি তাকে অশ্রদ্ধা ও অনাবশ্যক বলে মনে করবে। তাতে আপনা থেকেই তার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য কলার মত নৃত্যকলার চর্চাও যে ধ্বংস হবে একথা নিশ্চিত করে বলা চলে। থাকবে কেবল শিক্ষাবিভাগ-কর্তৃক নির্দেশিত কয়েকটি নাচ। একথা মনে রাখতে হবে যে, এই ভাবেই একদিন বিদ্যালয়গুলি নাচকে অবহেলা করেছিল বলেই সেই শিক্ষায় বর্ধিত শহরবাসী শিক্ষিত মাত্রেই নৃত্যকলার প্রতি মনে ঘৃণা পোষণ করেছে।

এ যুগের বিদ্যালয়গুলি সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সুতরাং প্রাচীন গ্রামসমাজের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নৃত্য-গীতের যে শিক্ষা গ্রামবাসীরা পেত, এ যুগে তার দায়িত্ব গিয়ে পড়ছে বিদ্যালয়গুলির উপর। তাই বিদ্যালয় ছেলেমেয়েদের মনকে যে ভাবে তৈরি করবে, সমাজের চিন্তাভাবনা সে ভাবেই রূপ নেবে। ধর্ম-উৎসবের সঙ্গে জড়িত গ্রামে গ্রামে যে নানারূপ বিচিত্র নৃত্যকলার সৃষ্টি হয়েছে, সেই সৃষ্টির ধারাটি ধর্ম-উৎসববিহীন বিদ্যালয়ে আর কি ভাবে বজায় রাখা সম্ভব, বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিকল্পনার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাঁদের অবশ্যই ভাবতে হবে। যদি তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনা-নুসারে অল্প কয়েকটি নাচের মধ্যেই এত বড় দেশের নৃত্য-বৈচিত্র্যকে রুদ্ধ করে রাখতে চান, তবে তা হবে মৃত্যুর সমান। এবং তাতে গ্রামের স্বাভাবিক সৃজনী প্রতিভার মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। ভারতের গ্রামশিল্পীদের সৃষ্ট নাচের মত এত বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সেই বৈচিত্র্যের উৎসকে নষ্ট করার কোন কারণ যেন আমাদের হাতে না ঘটে। উপস্থিত উচিত হবে নাচের সম্পূর্ণ তালিকা রচনা হয়ে গেলে পরে, যে প্রদেশে যে-সব নাচ আজও প্রচলিত আছে, সেই প্রদেশের বিদ্যালয়ে কেবল সেই সব নাচ-গুলিকেই অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে নির্দেশ করা। যে অঞ্চলে

নাচ নেই, কেবল সেখানকার জন্যে নাচ নির্বাচন করে দেওয়া যেতে পারে। তাতে করে প্রত্যেক প্রদেশে প্রচলিত নাচগুলি পুনর্জীবন পাবে ও দেশের মধ্যে তা আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। তখনই ভারতীয় নৃত্যের বহুরকম বৈচিত্র্যের অধিকারে আমরা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অহঙ্কার করতে পারবো। এই উপায়ে গ্রামের নাচগুলিকে দেশের মধ্যে আরো ছড়িয়ে দিতে পারলেই আমরা উচ্চস্তরের নৃত্যকলায় যুগোপযোগী নতুন সৃষ্টির পথে এগিয়ে যেতে পারবো। সেই কারণে নতুন পরিকল্পনার দ্বারা এতদিনকার গ্রামে প্রচলিত নৃত্য বৈচিত্র্যগুলি যাতে নষ্ট না হয়, শিক্ষা বিভাগ যেন সেই পথে চিন্তা করেন এবং বিদ্যালয়ের দ্বারা দেশের নৃত্য আন্দোলনকে সেই পথেই পরিচালিত করেন। শহরের ছেলেমেয়েদের জন্যে যে নাচই আজ নির্বাচিত হোক না কেন তাই হবে তাদের পক্ষে নতুন, সুতরাং সেখানে বাছাবাছির কোন প্রশ্নই উঠছে না। কিন্তু গ্রামের অবস্থা তো তা নয়। তাই নৃত্যবিষয়ে আমাদের যে-কোন পরিকল্পনা রচনার সময় শহর ও গ্রামকে একসঙ্গে চিন্তার মধ্যে রাখতে হবে, তবেই হবে সে পরিকল্পনা সার্থক। কারণ পূর্বেই বলেছি যে, গ্রামে নাচ আছে। তা আছে বলেই এ যুগের শহরবাসী শিক্ষিতদের নৃত্য আন্দোলনে সেই গ্রামের নাচগুলিই হল মূল ভিত্তি। এই আন্দোলনকে সফল করে তুলতে শহরবাসীদের ঐ গ্রামবাসীদের কাছেই ছুটতে হচ্ছে, এবং ভবিষ্যতেও ছুটবে। গ্রামবাসীরা নাচকে বাঁচিয়ে না রাখলে দেশে-বিদেশে যে-সব ভারতীয় নৃত্যদল আজ নাচে যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছেন তা এত সহজ হত না। ভারতের সব শ্রেণীর মধ্যে নাচকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে, গ্রামের সম্পদকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে, তার বৈচিত্র্য সৃষ্টির ক্ষমতাকে লুপ্ত হতে না দিয়ে, কি করে সকলের মধ্যে নাচকে নির্মল আনন্দের খোরাক হিসেবে প্রচার করা যায়, বিদ্যালয়ের নৃত্য পরিকল্পনার সেইটিই যেন হয় মূল লক্ষ্য।

সিংহলের কাণ্ডি-নৃত্য বা 'উদারানাটুম্'

সিংহলের কাণ্ডি-নৃত্যের ছবি যখন প্রথম দেখি তখন খুব আশ্চর্য লেগেছিল নর্তকদের দাঁড়াবার কায়দা ও হাত-পায়ের বিচিত্র ভঙ্গী দেখে। এর পূর্বে উচ্চাঙ্গের পুরুষ-নৃত্য দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি, কেবল মণিপুর ও উত্তর-ভারতের কয়েকটি নাচের সঙ্গে পরিচয় ছিল। সিংহলের এই ছবিতে নর্তকদের দেহের ভঙ্গীতে বীরোচিত নৃত্যের আভাস পেয়েছিলাম। তার পরে দক্ষিণ-ভারতের পুরুষ-নৃত্য 'কথাকলি' শেখার সুযোগ হয়। কিন্তু তখনও সিংহলের সেই নর্তকদের ছবির কথা মন থেকে যায় নি। ১৯৩৪ সালে শান্তি-নিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অভিনয় উপলক্ষ্যে সিংহলে গিয়ে কাণ্ডির বীরোচিত পুরুষ-নৃত্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেই বছরেই শান্তিনিকেতনের এক সিংহলী বন্ধুর নিমন্ত্রণ পেলাম, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের রবীন্দ্র-সংগীত ও শান্তিনিকেতনের নাচ শেখাবার জন্য। রাজী হলাম, ভাবলাম সে-দেশের বিখ্যাত পুরুষ-নাচও এই সুযোগে শিখে আস্‌ব।

সিংহলী ভাষায় এই নৃত্যের নাম 'উদারানাটুম্'। বর্তমানে এই নাচটি এ-দেশের শ্রেষ্ঠ নৃত্য ব'লে সিংহলীরা মনে করে। ইংরেজী-শিক্ষিত অধিবাসীরা একে কাণ্ডি-নাচ নামে সর্বত্র প্রচার করেছেন। বর্তমানে সিংহলের মধ্যপ্রদেশের শহর কাণ্ডির নামেই এই নৃত্য পরিচিত; এই শহরের নামেই প্রদেশটিও কাণ্ডি-প্রদেশ নামে পরিচিত। এই প্রদেশেই এই সম্প্রদায়ের নর্তকদের প্রধান সমাবেশ-স্থল। কাণ্ডিতে বুদ্ধের দন্ত-মন্দির আছে, শহরটি বৌদ্ধদের একটি প্রধান তীর্থস্থান। এইখানেই সিংহলের শেষ নরপতির রাজধানী

ছিল। প্রাচীন কালের অনেক পরিবর্তন হয়েছে,' কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ উৎসবগুলি আজও বেঁচে আছে। দলে দলে নাচিয়েরা আসে গ্রাম থেকে, উৎসবে যোগ দিতে।

সিংহলের গানের বিষয় জানতে গিয়ে দেখতে পাই—অতি সাধারণ চাষীর গান, গরুর গাড়ীর গান, নৌকার গান, ছেলে-ভুলানো গান অথবা নাচের সঙ্গে জড়িত গান, তা ছাড়া আর কোন প্রকার গান নেই বললেই হয়; এগুলি প্রায় সবই একগোত্রীয়—পল্লীসংগীত বা লোকসংগীত জাতীয়, অতি সাধারণ কথা ও সাধারণ মিষ্টি সুর। সে-দেশের তামিলদের ভিতর দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটী সংগীতের চলন আছে খুবই, তবে সে-দেশের বৌদ্ধদের ভিতর এই গান বেশী আমল পায় না, তারা উত্তর-ভারতীয় সংগীতকেই পছন্দ করে বেশী। উত্তর-ভারত থেকে কিছুকাল পূর্বে এদেশের বৌদ্ধ যুবকদের চেষ্টায় থিয়েটারী গানের আমদানী হয়েছিল খুব। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় তাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে। বর্তমানে উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথের বাংলা গানের প্রতি বিশেষ ভাবে তারা যত্ন নিচ্ছে।

নাচের এখনও অতটা দুরবস্থা আসে নি। এদেশে অনেকগুলি প্রাচীন নৃত্যধারা আজও অশিক্ষিত জনসাধারণ সচল রেখেচে। তার ভিতর কাণ্ডির নাচই প্রসিদ্ধ। এ-নাচ যে এ-দেশেরই উৎপত্তি তা মনে হ'ল না; এর সূত্রপাত হয় দক্ষিণ-ভারতের নাচ থেকে।

এই নাচের প্রথম সূত্রপাত করেন গজবাহু নামে নরপতি, খ্রীস্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তাঁর রাজধানী ছিল অনুরাধাপুরে। ইনি দক্ষিণ-ভারতের চোল-রাজাকে একবার পরাজিত করেন; তারই স্বীকৃতি-স্বরূপ চোলরাজ বার শত বন্দী ও সেদেশের পত্তিনী দেবীর অর্থাৎ দুর্গার পায়ের সোনার মল গজবাহুকে উপহার দেন। গজবাহু রাজধানীতে ফিরে এসে দক্ষিণ-ভারত-বিজয়ের স্মৃতি-স্বরূপ একটি

উৎসবের প্রচলন করেন ও পত্তিনী দেবীর মন্দির স্থাপনা ও তাঁর পূজা প্রচার করেন। ঐ বন্দীদের মধ্যে যারা ছিল নর্তকশ্রেণীর, তাদের প্রতি আদেশ হ'ল—নৃত্যে গানে এই উৎসবকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তুলতে। আজকালও এই উৎসব কাণ্ডিতে চলে আসছে সেই বীরের স্মৃতিপূজারূপে। ক্রমে এই নাচ উৎসবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল, সিংহলবাসীরাও এ-নাচে দক্ষ হয়ে উঠল। এ-নাচ বর্তমানে বৌদ্ধধর্মের অঙ্গরূপে দেখছি, কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ-নাচের সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ ছিল না। সেই সময় পোলানারুয়ার রাজা বিজয়বাহু সর্বপ্রথম এই নাচকে বৌদ্ধ উৎসবের অঙ্গীভূত করেন। রাজা নিজেও এ-নাচ খুব পছন্দ করতেন। সেই শতাব্দীতে পরাক্রমবাহু নামে আর এক নরপতি এ-নাচে বিশেষ ক'রে উদ্যোগী হন, তাঁর চেষ্টায় রাজপরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই নাচের চর্চা রাখতেন। রাজা নিজেও সুদক্ষ নর্তক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বিশেষ ক'রে পুরুষদের এ-বিষয়ে উৎসাহিত করেন। বর্তমানে ডম্বুরাহাতে নাচ কাণ্ডি-নাচের একটি প্রথা। এর প্রথম চলন করেছিলেন এই রাজা স্বয়ং। নাচের আরও পরিবর্তন তিনি এনেছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক গোলযোগে এই নাচ আর তেমন উৎসাহ পায় নি; চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাণ্ডি-নাচকে রাজা বিজয়বাহু আবার সজীব করলেন, সব নাচিয়েদের একত্র ক'রে। সব প্রাচীন উৎসবাদির তিনি পুনঃপ্রচলন করলেন। কিন্তু সেই রাজার মৃত্যুর পর আর সে রকম উৎসাহ দেবার লোক ছিল না। তখন দেশে পর্তুগীজদের আধিপত্য, তাদের জ্বালায় সুস্থির হয়ে কেউ রাজধানী গড়বার সুযোগ পায় না। নাচিয়েরাও রাজাদের উৎসাহ বা সাহায্য না পেয়ে নিরাপদ স্থানে থাকবার ইচ্ছায় মধ্যপ্রদেশ কাণ্ডিতে আশ্রয় নিল। সেখানে নিজেরা কোন রকমে নাচের প্রতি নিজেদের ভালবাসার টানে এই নাচকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এইসময়

থেকে এই নাচ সম্পূর্ণরূপে একটি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। তারাই 'বেরোয়া' নামে লোকের কাছে পরিচিত।

বহুকাল পরে দ্বিতীয় বিমলধর্মাসূর্য ধর্মের প্রচারে উদ্যোগী হন ও বুদ্ধের দন্ত-মন্দির স্থাপনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার নাচিয়েরা এসে তাতে যোগ দিল।

পুনরায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা কীর্তিশ্রী খুব উৎসাহের সহিত ধর্মকার্যে মন দিলেন। তিনিই নূতন ক'রে ভিক্ষুসংঘ ইত্যাদি স্থাপনা, মন্দির-রচনা প্রভৃতি করলেন। কীর্তিশ্রী রাজা গজবাহুর দক্ষিণ-ভারত-বিজয় উৎসবের পুনপ্রবর্তন করলেন, পত্তিনী দেবীর মন্দির স্থাপনা করলেন। বর্তমান কাণ্ডিতে যতগুলি বৌদ্ধ উৎসবের চলন আছে তার পুনঃপ্রবর্তক এই রাজা। তাঁরই উৎসাহে নাচিয়েরাও আবার নাচের চর্চায় মনোযোগ দেয়, তার পর থেকে ধর্ম-উৎসবাদি ও নাচ-গান নির্বিঘ্নে আজ পর্যন্ত চ'লে আসছে।

এই নর্তক-সম্প্রদায়ের সকলেই বৌদ্ধ এবং এদের নাচ বৌদ্ধ উৎসবের সঙ্গে জড়িত হলেও অনেক উৎসবে হিন্দু দেব-দেবীর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কাণ্ডিতে বুদ্ধদন্ত-মন্দির ছাড়া আরও তিনটি মন্দির আছে, একটি পত্তিনী দেবীর (দুর্গা), একটি নাথ-দেবতার (মহাদেব), একটি কাতারগামার (কার্তিক) ও অপরটি বিষ্ণুর। বৌদ্ধরা এই দেবতাদেরও শ্রদ্ধার সহিত পূজা করে। পত্তিনী দেবীর এদেশে আগমনের কথা আগেই বলা হয়েছে, অন্য দেবতারাও এসেছিলেন এইরূপ নানা অবস্থায় প'ড়ে।

আগেই বলেছি, সিংহলের কাণ্ডি-প্রদেশের বেরোয়া জাতই এ-নাচের চর্চা ক'রে থাকে। রাজা কীর্তিশ্রীর পরে কোন রাজাই জন-সাধারণের মধ্যে এর প্রচার করবার আর চেষ্টা করে নি। তার ফলে হ'ল এই, অন্যান্য সম্প্রদায় মনে করতে লাগল, এ-উৎসব-সংক্রান্ত নাচ বেরোয়াদেরই জন্যে। সাধারণে একে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখেই দেখেছিল

এই কারণে। অন্যান্য প্রাচীন নাচও বর্তমানে দুরবস্থায় এসে ঠেকেছে। কিন্তু বৌদ্ধ উৎসবের কল্যাণে কাণ্ডি-নাচ তার মান বাঁচিয়ে আছে।

কাণ্ডি-নাচে অভিনয়ের ভাগ নেই বললেই হয়। মনে হয় ছন্দোবদ্ধ নাচটাকেই এরা বড় ক'রে দেখেছিল ; তবে নাচের সব অঙ্গ মিলিয়ে দেখলে একটা প্রচণ্ড বেগের পরিচয় পাওয়া যায়। সব নাচগুলি গানের সুরে তালে খুব পাকাপাকি ভাবে বাঁধা, কোন গোঁজামিল বা অনাবশ্যক জিনিস নেই। এক-একটি গানের নামে এ-নাচগুলির পরিচয়। এই ভাবের আঠারটি গান আছে ; এগুলির নাম এরা দিয়েছে 'বন্নম্'। যেমন :

দাহক (শঙ্খের গোল দাগ), গজ, তুরঙ্গ, উরগ, মুষল (খরগোস), উকুসা (ঈগল পাখী), বৈরুডি (প্রসিদ্ধ মণি), হনুমা (হনুমান), ময়ুরা (ময়ূর), ক্তাউলা (মুরগী), সিংহাধিপতি (সিংহ), অসদৃশ (কোন দেবতার নাম), কীরলা (সমুদ্রের পাখী), মণ্ডুক, ইনাডি (কাশ-জাতীয় পুষ্প), সুরপতি, গণপতি ও উদার (গর্বিতা রমণীর অহঙ্কার)।

এই যে আঠারটি নাম দিলাম, এর কতকগুলি তৈরি হয়েছিল জন্তুর চলন বা ভঙ্গী অনুকরণ ক'রে—উপরে সেগুলির নাম দেখে তা বোঝা যাবে। অন্যগুলি তৈরি হয়েছিল তাদের গুণ ও রূপ-বর্ণনা নিয়ে ; যেমন সুরপতি, গণপতি, উদার ইত্যাদি।

বন্নম্-এর আবার চারটি ভাগ—'তানম্', 'কবিয়ে', 'কাস্তেরম্' ও 'আড়াউবা'। তানম্ হ'ল ঠিক উত্তরভারতীয় সংগীতের তেলেনার মত। তাতে কোন কবিতার কথা নেই, কেবল 'তা-না-না' এই প্রকারের কতকগুলি শব্দ তালের সঙ্গে গাওয়া হয়। সব তানম্-এর পদক্ষেপ, দেহভঙ্গী ও হস্তচালনা প্রায়ই এক প্রকারের। এর পরে আরম্ভ হয় 'কবিয়ে'। এই অংশে পূর্বের তানম্-এর সুরের সঙ্গে কথা বসানো থাকে। এই কথাগুলিতেই গানের প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায়। এই অংশের নাচের ভঙ্গীতে এক নাচের সঙ্গে অপর নাচের কিছু প্রভেদ

বোঝা যায়। এদেশে নাচিয়েরা নিজেই গান গেয়ে নাচে। 'কবিয়ে' শেষ হয় ছোট একটি তালের তেহাই বাজনার সঙ্গে। এই ছোট তেহাইয়ের অংশের নাম এরা দিয়েছে 'কাস্তেরম্'। তার পরেই আরম্ভ হয় 'আড়াউবা' অর্থাৎ সেই গানের তালের তোড়া ও পরণ ইত্যাদি। এই ভাবে একটি 'বন্নম্' সম্পূর্ণ হ'লে, আবার আর একটি 'বন্নম্' আরম্ভ করে। কাণ্ডি-নাচের গানে যে বিশেষ বৈচিত্র্য আছে তা নয়। গ্রাম্য সংগীতের ধরনের অল্প-পরিসর সুরের মধ্যেই লাইনের পর লাইন এক ভাবে গেয়ে যায়। তবে একটি বন্নম্-এর সঙ্গে অপর বন্নম্-এর সুরে কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। বর্তমানে গানের প্রতি নজর এই নাচিয়েরা ততটা দেয় ব'লে বোধ হয় না। কোন রকমে তালে গেয়ে যেতে পারলেই এরা সন্তুষ্ট। তবে মনে হয়, আরম্ভে গানগুলি সম্ভবত আরও সুন্দর ছিল। এখানে আমি একটি সম্পূর্ণ বন্নম্-এর নমুনা তুলে দিলাম, তাতে আমার উপরের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হ'তে পারে। এই বন্নম্‌টির নাম 'বৈরুডি', উত্তর-ভারতের দাদরা তালে রচিত।

'তানম্'

তানানে তানেনা তানেনা তানা
তানানে তানাতে তানানে তানা
তানেনা তানা তানেনা তানা
তানেনা তানা তাম্‌দে না তাম্‌দে
না নাম্॥

'কবিয়ে'

অগয় বদন কবি বরুণ, রঙ্গয়দনে কল রচনা
মট উরণ নোব মেদিনা মহতুগে অবসর রাগেনা
সমাব॥
ইসুরু দেবীন্দু বডিনাদিনা, কেহেতু বিমনা দেকনিতিনা
এমবিমনা, দেবীবডিনা, কেহতুদদক কোই বডিতি
কমাবা॥

বিমনা সমগা কেহেত্তুগণা, ইস্থরু দেবীন্দুতুতি দেমিনা,
মেমবরুণা কল এহেনা পাতাল বৈরুডি বন্নমমেবা ॥
ওবিনা মেসব তুল পেমিনা, কবিয়নেতুব বরুবরুণা
কলহুদনা নেতাওবিনা, উগতুগে বল বেদি মেকাদা
পমাবা ॥

গানটির অর্থ নীচে দিলাম। নর্তকেরা দর্শকদের গানে জানাচ্ছে,

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আমার মনের কথা আপনাদের জানাচ্ছি—এ নাচের আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগের সামর্থ্য সকলের হয় না, যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের পক্ষেই তা সম্ভব।

ভগবান ইস্থরু পথে যেতে "কেহেতু"র নাচ দেখে আনন্দ পান ও নৃত্যের দ্বারা তিনি তাঁর আনন্দ প্রকাশ করেন—তারই নাম পাতাল বৈরুডি বন্নম্॥

আমি আজ যে-নাচ দেখাতে যাচ্ছি, সে-নাচ ভগবান ইস্থরুর সেই আনন্দের নাচ। আশা করি এতে সকলে আনন্দ পাবেন।

সব বন্নম্-এর কবিয়ে-অংশে, এই ভাবে কি ক'রে সেই নাচের আরম্ভ হ'ল, কি তাল ব্যবহার হচ্ছে, কি ভাবে নাচতে হবে, সে সব বিষয়েরই আলোচনা হয়।

'কান্তেরম্'

\+ * + *
তাং তারেকিটাকুন্‌দাং তারেকিতা কুন দা দোং
\+ ০ +
রাজেন্ জিকুন্‌দা তা ॥

'আড়াউবা'

\+ + +
তাক্‌রোম্‌দাং গাজিং জিকুন্‌দা তাকরাজিকরা
\+ + +
তাতা জিকরা তাকরোম দাং গাজিনজিকুনদা
\+ + +
তা জিংতারে কিটা কুনদাং তা ॥

কাণ্ডির—নাইয়াণ্ডি নাচ

কাণ্ডির—নাইয়াণ্ডি নাচ

কাণ্ডির নর্তক ও বাদক

কাণ্ডি নাচেব বাজনা

১। বেড়ে ২। পান্তেক ৩। উড়েক্কি

কাণ্ডির—পান্তেরু নাচ

এই ভাবে বন্নম্‌গুলি প্রায় সব তালেই রচিত হয়েছে ; কাওয়ালী, দাদরা, ঝাঁপতাল, রূপক, তেওড়া ইত্যাদি আরও কয়েক প্রকারের। যে কোন বন্নমে, 'আঁড়াউবা' সব সময় যে একটিই হবে তার কোন কথা নেই, বড় বড় নর্ত্তকেরা "আড়াউবা"য় বহু প্রকারের তালের নৃত্য ক'রে থাকে।

নর্ত্তকেরা এ-নাচ বাইরে মুক্ত আকাশের তলে দল বেঁধে নাচে। সাধারণত এক-এক দলে পাঁচ-ছয় থেকে আরম্ভ ক'রে আরও বেশী লোক থাকতে দেখা যায়। কয়েকটি কারণে এ-নাচ ঘরে হতে পারে না। এক কারণ, এ-নাচ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, তাই বদ্ধঘরে অল্পক্ষণের মধ্যেই নর্ত্তকেরা কাতর হয়ে পড়ে ; এর জন্য যেরূপ প্রশস্ত ঘরের প্রয়োজন তাও পাওয়া কঠিন, এবং সঙ্গে যে-বাজনা ব্যবহৃত হয় তার শব্দ অত্যন্ত কড়া, কোন রঙ্গমঞ্চ বা গৃহের উপযোগী একেবারেই নয়। সাধারণত নাচিয়েদের সঙ্গে দু'জন বাজিয়ে থাকে। এই বাজনার উচ্চ শব্দে নাচিয়েরা খুব উৎসাহিত হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেচেও কোন কষ্ট বোধ করে না। যন্ত্রটির নাম 'বেড়ে'। শোনা যায়, এটি তামিলদের 'বরবাদ্য' নামে বাদ্যযন্ত্রের অপভ্রংশ। আকারে প্রায় উত্তর-ভারতীয় পাখোয়াজের মত কিন্তু শব্দের পার্থক্য আছে অনেক, দক্ষিণ-ভারতের 'কথাকলি' নৃত্যের বাজনা 'মাদলম্'-এর মত অবিকল দেখতে।

এই কাণ্ডি-নাচের তিনটি ভাগ আছে। প্রথমটির নাম 'নাইয়াণ্ডি', খালি-হাতে নাচ। এই পদ্ধতিটিই শ্রেষ্ঠ। এতে আমরা নাচের ভঙ্গীর বৈচিত্র্য পাই বেশী। নাচের সময় হাত-পা ও দেহ সব যেন এক হয়ে নাচতে থাকে, এইটাই বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে। এ-কথাটা একটু বিস্তৃত ক'রে বলা দরকার।

ভারতের অনেক নাচে দেখা যায় হাতের ভঙ্গী বা মুদ্রার আধিপত্য বেশী, আবার কোন কোন নাচে দেখি পায়ের নানাপ্রকার তালের

কাজ দেখানোই নাচিয়েদের প্রধান চেষ্টা। অবশ্য এ-বিষয়ে মণিপুরের কাজ অন্য রকমের; তারা হাত-পা ও দেহ সকলের ভিতর একটা সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে-নাচে লালিত্যের প্রতি ঝোঁক বেশী। কাণ্ডি-নাচের মধ্যে সেইখানে আমরা পাই হাত-পা ও দেহের সামঞ্জস্য, এবং তার সঙ্গে প্রচণ্ড বেগ ও পুরুষোচিত বীর্যের প্রকাশ।

দ্বিতীয় পদ্ধতির নাম হ'ল 'উডেক্কি' নাচ। উডেক্কি বা 'ডম্বরু' এক হাতে ধ'রে অপর হাতে বাজিয়ে নাচতে হয়। এতে ভঙ্গীর কিছু নূতনত্ব পাই না—পায়ের চলন ও ভঙ্গী নাইয়াণ্ডি নাচের অনুরূপ, গানগুলিও এক। এই ডম্বরু দক্ষিণ-ভারতের একটি অতি প্রাচীন যন্ত্র। এটি সেখান থেকেই সিংহলে গিয়েছিল ব'লে সকলে একমত।

তৃতীয় নাচটির নাম 'পান্তেরু'। পান্তেরু হচ্ছে পিতলের একটি চেপ্টা দেড় ইঞ্চি চওড়া রিং। তাতে অনেকগুলি ছোট ছোট পিতলের জোড়া চাকতি লাগানো, ঝাঁকুনি দিলেই ঝমঝম শব্দ হয়। নাচের সময়, দুই হাতে, বাজনার তালে, কখনও ঝাঁকুনি দিয়ে, কখনও শূন্যে তুলে লুফে ধরে বাজাতে হয়। এই নাচেও পায়ের কাজ অবিকল নাইয়াণ্ডি নাচের মত।

আজকাল সিংহলে এইসব নাচ দেখবার বিশেষ সুযোগ বৌদ্ধ উৎসবগুলিতে। নর্তকেরা কোন-না-কোন বৌদ্ধ মন্দিরের সহিত সংশ্লিষ্ট। সাধারণত তারা চাষবাস করে, উৎসবের ডাক পেয়ে একত্র হয়। এই উৎসবগুলির কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেল। উৎসবের নাম এদের ভাষায় 'পেরহেরা'—'অবিরুধু পেয়হেরা', 'পেরহেরা', 'বৈশাখ পেরহের' 'পোষম্ পেরহের', 'কাণ্ডি পেরহেরা', 'কারচি পেরহেরা' ও 'আলুট্-সাল্ পেরহেরা'।

'অবিরুধু' পেরহেরা হ'ল নববর্ষের উৎসব; বাংলা নববর্ষের সঙ্গে দুইএক দিনের পার্থক্য হয়।

'বৈশাখ পেরহেরা' হ'ল এ-দেশের সব চেয়ে বড় উৎসব। এই উৎসব হয় বৈশাখী পূর্ণিমার দিন, এই দিন ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন এবং বুদ্ধত্ব ও নির্বাণ লাভ করেন। বৌদ্ধদের বিশ্বাস, বুদ্ধদেব স্বয়ং ঐ দিনেই সিংহলে এসেছিলেন। এই সময় দেশের গ্রামে নগরে রাস্তাঘাট বাড়িঘর সাজিয়ে, মেয়ে-পুরুষ দলে দলে মিছিল করে বেরিয়ে পড়ে। ধনীরা রাস্তায় খাবার বিলি করে, বৌদ্ধরা বাড়ির সামনে বুদ্ধের জীবনী, জাতকের গল্প অবলম্বন ক'রে মূর্তি ছবি টাঙিয়ে রাখে, দলে দলে নরনারী ও শিশুরা দর্শনপ্রার্থী হয়ে মন্দিরে যায়, নর্তকেরা সেদিন নাচে গানে মন্দির-প্রাঙ্গণ মুখরিত ক'রে তোলে।

তৃতীয় উৎসব হ'ল—'পোষম্ পেরহেরা'। অশোক-পুত্র মহিন্দ অনুরাধাপুরের নিকটবর্তী 'মহিন্তালে' পাহাড়ে, রাজা 'দেবানম্পিয়াতিস্সা'কে যেদিন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন, সেই শুভ দিনকে স্মরণ করার জন্যই এই উৎসব। এর প্রধান আড্ডা অনুরাধাপুর, সেখানে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর ভিড় হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি এই উৎসব হয়।

ভাদ্রমাসে কাণ্ডিতে যে পেরহেরা হয় তার খুব নাম। বিদেশে 'কাণ্ডি পেরহেরা'র খবর লোকে খুব জানে। এটি হ'ল কাণ্ডি-নাচিয়েদের বিশেষ উৎসব। পূর্বেই বলেছি এ-উৎসবের আসল উপলক্ষ্য হচ্ছে রাজা গজবাহুর বিজয় উৎসব। এই পেরহেরায় মিছিল বের হয় খুব চমৎকার। তার জাঁকজমকে দেশী বিদেশী সকলেই মুগ্ধ। বহু সংখ্যক হাতী, লোকজন ও নাচিয়েরা দলে দলে এই মিছিলে থাকে। কাণ্ডি-নাচের ভাল কিছু দেখতে হ'লে এই হ'ল উপযুক্ত উৎসব।

এর পরে হেমন্তকালে উৎসব হয়—আমাদের দেশের দীপালি উৎসবের মত, প্রায় সেই সময়েই পড়ে। তখন মন্দিরে মন্দিরে

হাজার হাজার বাতি জ্বালানো হয়; পূজাও হয়ে থাকে। এই উৎসবের নাম 'কারচি'।

আমাদের দেশের নবান্নের মত এ-দেশেও নূতন ধানের একটি উৎসব হয়। প্রথমে গৃহীরা নূতন চাল মন্দিরে উৎসর্গ করবে,—পরে সব একসঙ্গে রান্না ক'রে পুরোহিত তা দেবতার প্রসাদ ক'রে সকলকে বিলিয়ে দেবে। এই নাচের নাম 'আলুটসাল্'।

কাণ্ডি-নাচিয়েদের ভিতর মুখোস ব্যবহারের রীতি নেই। এ-দেশের অন্যান্য পুরাতন নৃত্যের মধ্যে মুখোসের ব্যবহার খুব দেখা যায়। আলোচ্য নর্ত্তকেরা ব্যবহার করে মাথায় রুপোর মুকুট, বুকে সুন্দর পুঁতির গহনা, কোমরে কাপড়ের বিচিত্র ভাঁজের উপরে রুপোর কাজ-করা ঝকঝকে কোমরবন্ধ, হাতে থাকে মোটা পিতলের বালা। ব্যয়বাহুল্যের জন্য রুপোর মুকুটটা সব নাচিয়েরা ব্যবহার করতে পারে না।

এই নাচের ঐতিহাসিক উৎপত্তির কথা পূর্বেই বলেছি। এবার নাচিয়েদের মুখে এই নাচের উৎপত্তির যে গল্প শুনেছি তাই লিখে শেষ করি।

এ-দেশের প্রাচীন নাচিয়েদের বিশ্বাস, ভগবান মহাব্রহ্মণ্ 'তদ্' 'জিৎ' 'তোম্' 'নাম্' এই কয়টি তালের শব্দ প্রথম উচ্চারণ করেন। বিশ্বকর্মা তাঁর মুখ থেকে এই শব্দ কয়টি শুনে, তাই নিয়ে তিনি বত্রিশ রাগের সৃষ্টি করেন ও নয়টি নয় প্রকারের নাচ তৈরি করেন; নাচের উপযোগী দুটি বাদ্যযন্ত্রও তৈরি করলেন, একটির নাম 'বেড়ে' অপরটি 'ডাক্কি'। পরে ঈশ্বরের সামনে এই নিয়ে নাচ-গান ক'রে শোনালেন। তখন "মনু" অথবা "মহাসম্মত" পৃথিবীর রাজা হয়ে রাজত্ব করছিলেন। বিশ্বকর্মা, ঈশ্বর ও অন্যান্য দেবতারা গন্ধর্বসহ তাঁর সভায় উপস্থিত হয়ে এই নাচ তাঁকে দেখান। নরপতি সেই নাচ বিশ্বকর্মার কাছ থেকে পেয়ে পরে পৃথিবীতে প্রচার করলেন।

নাচের আরম্ভে যে-বন্দনা গান হয়, তার সাধারণ অর্থেও এই গল্পটিকে প্রকাশ করে :

ভগবান বিশ্বকর্মা নাচের সৃষ্টি ক'রে ঈশ্বরকে দেখান, তাঁরা উভয়েই মর্ত্যে মানুষের কাছে তার প্রচার করেন। পৃথিবীর অধিপতি মহাসম্মত এই নাচ গ্রহণ করেন। সেই দেবতাদের নমস্কার, তাঁরা এ-নাচকে তাঁদের আশীর্বাদ দ্বারা রক্ষা করুন।